তেপান্তরী ২০০৮ Tepantori 2008

একবিংশ সংকলন 21st Issue

বড়দিন সংখ্যা Christmas Edition

সম্পাদক মন্ডলীঃ

যোসেফ ডি' কস্তা (বিকাশ)
সুবীর এল রোজারিও
শৈলেন সরকার

সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানেঃ

সাইমন গমেজ

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

শিলা রোজারিও
ডোমিঙ্গো অনিল গমেজ
ম্যাবেল গমেজ
জেমস পালমার (অসীম)
ডেভিড সরকার
ইগনেশিয়াস গমেজ (দিলীপ)
হেবল গমেজ
রানী গমেজ

প্রচ্ছদঃ

মার্ক হাওলাদার (রনি)

গ্রাফিক্স ও কম্পোজঃ

Graphic: Masud Anwar (Rana)
Compose: Nazmul Alam (Roman)
Supervision: Rashed Anwar
www.USColorPrinting.com
Tel: (917) 607-6833
Fax: (866) 304-1553

ভেতরের পাতায় . . .

২ ..... সম্পাদকীয়
৩ ..... কনসুলেট জেনারেল-এর শুভেচ্ছা
৪ ..... সভাপতির শুভেচ্ছা
৫ ..... সাধারণ সম্পাদকের শুভেচ্ছা
৬ ..... ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজের শুভেচ্ছা
৭ ..... রেভাঃ জেমস এস. রয়-এর শুভেচ্ছা
৮ ..... রেভাঃ টমাস এম. রয়-এর শুভেচ্ছা
৯ ..... পাস্টর জেমস সমীরণ বেরাগী'র শুভেচ্ছা
১০ ..... এস.এন.এস সভাপতি ডেরিক পিনেরো'র শুভেচ্ছা
১৩ ..... Some American Holiday Traditions
১৯ ..... বড়দিনের রসময় শুভেচ্ছা / একটু ভেবে অথবা 'না'
২১ ..... পিতামাতার মুক্তি কিসে / কথায় বলে বিশ্বাসে ভগবান
২৩ ..... Road to Sunset
২৫ ..... রাজার প্রশ্ন ও তার উত্তর
২৭ ..... নিজে বাঁচি- দেশ ও জাতিকে বাঁচাই
২৯ ..... একাগ্রতার অগ্রাধিকার
৩৩ ..... St. Gregory School
৩৭ ..... রোম ভেনিসের গল্প
৩৯ ..... ভাওয়াল সমাচার
৪৩ ..... একান্নবর্তী পরিবার
৪৫ ..... My Determined Aspirations
৪৭ ..... বিশ্বাসের আরও এক ধাপ
৫১ ..... ঘুরে দাঁড়িয়েছে প্রবাসীর নেতৃত্ব
৫৩ ..... কীর্তনের ইতিহাস
৫৫ ..... জিজ্ঞাসা
৫৭ ..... প্রবাসী'র দিনগুলি
৭৩ ..... প্রেয়সীর বড়দিন
৭৭ ..... ধার করা বুদ্ধির ঝাঁচ
৮১ ..... প্রবাসীর ৩য় বাঙ্গালী কনভেনশন
৮৭ ..... যাদেরকে পেলাম
৮৯ ..... কৃতিত্বের স্বাক্ষর
৯০ ..... শুভ পরিণয়
৯১ ..... ৫০তম বিবাহ বার্ষিকী
৯৩ ..... যাদেরকে হারালাম

Published by:

Probashi Bengali Christian Association

P.O. Box 1568- New York- NY 10159-1568
Phone: (646) 773-7790 (917) 528-2391
Website: www.pbcausa.org E-mail: info@pbcausa.org

সম্পাদকীয়

কুয়াশার চাদর গায়ে দিয়ে শীত এসেছে আমাদের দুয়ার প্রান্তে। শীত যতই চেপে বসে খ্রীষ্টরাজের আগমনের কথা ততোই মনে হেসে ওঠে। আজ বিশ্বময় তীব্র অর্থনৈতিক সংকট বিদ্যমান। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে বিশ্বের মানব জীবনে অশান্তি– অরাজকতা ও হা–হা–কার বিরাজমান। প্রখ্যাত নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার দৃষ্টিতে "এ সংকট ক্রমশঃ ঘনিভূত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি যদি অব্যহত থাকে তাহলে এই মূল্যবৃদ্ধি বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্টিকে আরও দরিদ্র করে তুলবে। নিম্ন আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আরও কমে যাবে– সৃষ্টি হবে নিম্ন আয়ের বিশাল জনগোষ্টি – অর্থাৎ বিশ্বে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।" ইহা বিশ্ববাসির জন্য নিঃসন্দেহে এক দুঃসংবাদ। এমনি বিশ্বময় পরিস্থিতিতে জগতের মুক্তিদাতা– ত্রাণকর্তা– মানবপ্রেমিক রাজাধিরাজ্যের আগমন ঘটেছে। তিনিতো দারিদ্রের মাঝেই জন্ম নিয়েছেন– দরিদ্রদের ভালবেসেছেন– তাঁর সকল শিষ্যরাই তো ছিল জেলে– কারগ্রাহক ও দিনমজুর। তার পিতা ছিলেন কাঠমিস্ত্রী। তার আগমনে পৃথীবির মানুষের মাঝে বিরাজিত হতাশা নিরাশা দূরিভূত হবে– মানব মনে নূতন প্রান সঞ্চারিত হবে। নূতন আনন্দধারা জাগ্রত হবে– দিকে দিকে ঝংকার হবে শান্তির বানী। কারন তিনি তো শান্তিরাজ– আর দরিদ্রমুক্ত বিশ্বের জন্য প্রয়োজন শান্তি।

এ দিকে প্রবাসী বাঙালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে এসেছে নূতন পরিষদ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। ইতিমধ্যেই তারা কিছু কর্মসুচী বাস্তবায়ন করেছে। তার মধ্যে উল্লেযোগ্য হলো– ওয়াসিংটনে তীর্থের আয়োজন। ভোগবাদী সভ্যতার বিপরীতে সংযম ও আদর্শের কথা তারা প্রবাসিদের শোনাতে চায়। আধ্যাতিকতা ও নৈতিকতার উপর এই নেতৃত্বের নজর পরেছে। ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি নূতন দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়েছে– যা সর্বকালের ও সর্বসময়ের এক সামাজিক দাবী। এই নূতন নেতৃত্বে নূতন আশার স্রোত সৃষ্টি হোক। এই কামনা করি।

পরিশেষে– তেপান্তরীর সকল পাঠক/ পাঠিকা– লেখক লেখিকা ও সকল প্রবাসী ভাই–বোনদের জানাই বড়দিনের শুভেচ্ছা।

Consulate General of Bangladesh
New York

Consul General

11 December 2008

MESSAGE

I am pleased to know that **Probashi Bengali Christian Association, New York Inc.** is going to organize '**Christmas Re-Union-2008**' to be held on Saturday, December 27 2008. I would like to greet of Bangladeshi Christian Community on the occasion of the holy X-mass and extend thanks to the members of the organization for their noble initiative.

To-day, people of Bangladeshi origin are regarded as one of the most vibrant and dynamic group of expatriates in the United States. I believe, the Bangladeshi community has been able to create a special niche in the American society through their hard work, honesty and integrity. Each and every Bangladeshi living here is the flag bearer of the national ethos, religious and rich cultural values and heritage of profound peace and harmony of Bangladesh. We are proud of your achievements in this country and at the same time, gratefully acknowledge contributions of our expatriate community in nation building. We must remember that it is through our deeds that we would be able to uphold the dignity of our nation. I would encourage all members of our community to continue to carry on their efforts in creating a positive image of the Bangladesh in this country.

I take this opportunity to convey my warm wishes for the peace, progress and prosperity of all members of expatriate Bangladeshi Christian Community and their families and wish this event a resounding success.

(Md. Shamsul Haque)
Consul General

MESSAGE

Respected seniors and friends of Probashi Bengali Christian Association:

It gives me great pleasure to send you my hearty greetings for Christmas. I very much hope that you all have a joyous season. I am honored and fortunate again to lead a team of young intelligent innovative young members in the new executive board. I am confident that they will be soon experienced enough and learn quickly to lead our community on their own. I will do my utmost to achieve that goal. I believe that we need youth to take up innovative and dynamic leadership, be responsible not only for themselves and their immediate families but for our entire community to meet the challenges, bridge two culture into a pragmatic program, promote our age old Asian, specially Bangali values and rich culture and above all have a lot of fun under our savior Jesus Christ.

I also appeal to all our members to share-in some time for PBCA programs and activities, to come forward to help each other and always have a keen and loving eye upon our children. Time has come for our community people to take up some voluntary tasks not only for PBCA programs but also in our children's schools, church and in our work place. It is by sharing our experience and expertise, that we learn and advance, it is by sharing of whatever God has blessed us with, we fulfill our mission in this earth, and I am sure by doing this act of Christian charity, we become really happy and contended.

We have been able to perform in the past years for your generosity, and I am happy that our Tepantari has been published; I thank all of you for your kind support on all our year long activities.

Lastly I want to see more responsibility being shared by all the members along with the members of the executive board, advisors so that we feel that we are of one happy PBCA family. May the new born babe Christ bless us in the coming days?

Thank you.

Simon Gomes
President

সাধারন সম্পাদকের দপ্তর থেকে

বড়দিন সকলের আনন্দের দিন। "যীশু খ্রীষ্ট" এ'পৃথিবীতে এসেছিলেন শান্তির বার্তা নিয়ে। স্বর্গীয় দেবদূতরা মাঠে প্রহরীরত রাখালদের যীশু খ্রীষ্ট জন্মের এ বার্তা জানিয়ে বলেঃ

"আজ দাউদ নগরীতে তোমাদের ত্রানকর্তা জন্মেছেন
তিনি খ্রীষ্ট; স্বয়ং প্রভু" (লুক ২:১১)

স্বর্গীয় দেবদূতদের কথা শুনে রাখালেরা ছুটে যায় জুডিয়ার বেথেলহেমে এবং দেবদূতদের কথামত দেখতে পায় যাবপাত্রে শায়িত শিশু যীশুকে। এ'নবজাত শিশু "শান্তিরাজ" রাজ নামে আখ্যায়িত।

চলমান এ বিশ্ব পরিক্রমায় প্রতি বৎসর বড়দিন আসে আর যায়। জগতবাসী এ শুভদিনের আগমনের জন্য সারাবছর আমেজ থাকেন। বড়দিন বিশ্বের বুকে মহান সৃষ্টিকর্তার মিলন—শান্তি ও ন্যায়তার প্রতীক। পবিত্র বাইবেল অনুসারে—পূর্বদেশীয় পন্ডিতরা বহু বছর এ'দিনের অপেক্ষায় ছিলেন এবং যীশুকে দেখার জন্য পূর্বদেশ থেকে এসেছিলেন এবং শিশু যীশুকে উপহার দিয়েছিলেন স্বর্ন, গন্ধরক ও নির্জ্যাস।

আজকের এ'পৃথিবীতে নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি, মিলন ও ভালবাসার অভাব। পৃথিবীর অনেক দেশে যুদ্ধ, সংঘাত, মারামারি ও হানাহানি বিরাজ করছে। অনেক নিরপরাধ শিশু, মহিলা ও সাধারন জনগন আত্মঘাতি টেরোরিষ্টদের হিংসা ও ক্রোধের স্বীকারে পরিনত হয়েছে। মোম্বাই শহরের এ'নির্মম আত্মঘাতি আক্রমনে ২০০ মত প্রান হারিয়েছে এবং ৩০০ মত আহত হয়েছে। বড়দিনের নিরবিচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তি থেকে তাদের আত্মীয়—স্বজনসহ অনেকে বঞ্চিত হয়েছে।

সারাবিশ্বে ২০০৮ সাল নানাদিক থেকে স্বরনীয় হয়ে থাকবে। ওয়াল ষ্ট্রীট মানি ক্র্যাইসিসের ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রসহ সারাবিশ্বকে আর্থিক মন্দায় গ্রাস করেছে। আর্থিক মন্দা তথা আর্থিক মুক্তির জন্য মার্কিন জনগন প্রথমবারের মত কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে নির্বাচন করেছে। বাংলাদেশেও এ'বছর শান্তি ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য গনতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে যাচ্ছে। জাতি, ধর্ম, বর্ন নির্বিশেষে সুখ ও শান্তিতে থাকতে চায় আর বড়দিনের তাৎপর্য হল খ্রীষ্টিয় আদর্শ, শান্তি, ঐক্য, ভালবাসা, নম্রতা ও সেবা।

আসুন, আমরা যীশু জন্মের এ'তিথিতে বড়দিনের মুক্তির বার্তা সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেই এবং সেই সঙ্গে কামনা করি যেন "বড়দিন" সকলের সুখ, শান্তি ও আশির্বাদপূর্ন হয়। বড়দিন ও নববর্ষ আপনাদের সকলের জীবনে বয়ে আনুক সুখ, শান্তি ও মিলন।

জন মালো (রানা), পিবিসিএ

শুভেচ্ছা বাণী

"ধন্য আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, কারন খ্রীষ্টের আশ্রিত করে তিনি স্বর্গলোকের মত আধ্যাত্মিক আশির্বাদে আমাদের ধন্য করেছেন। জগৎসৃষ্টির আগেই তিনি আমাদের মনোনীত করে রেখেছিলেন খ্রীষ্টের আশ্রিতজন-রূপে, যাতে তাঁর দৃষ্টিতে একদিন আমরা পবিত্র হতে পারি, অনিন্দ্যই হয়ে উঠতে পারি। আমাদের ভালবেসে তিনি আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলেন যে, যীশুখ্রীষ্টের জন্যে আমরা তাঁর সন্তান হয়ে উঠবো। হ্যাঁ, এই ছিল তাঁর কৃপায় ভরা সংকল্প, যাতে বন্দিত হয় তাঁর সেই অনুগ্রহের মহিমা, যে অনুগ্রহে তিনি আমাদের ধন্য করেছেন তাঁর প্রিয়তম পুত্রের আশ্রিত করে। আমরা তো খ্রীষ্টেরই আশ্রিত হয়ে তাঁরই রক্তমূল্যে মুক্তি লাভ করি, লাভ করি আমাদের সকল অপরাধের ক্ষমা। ঈশ্বরের এমনই অনুগ্রহের বদান্যতা।"
(এফেসীয়দের কাছে সাধু পলের ধর্মপত্র ১:৩-৭)

পুণ্যপিতা পোপ ষোরশ বেনেডিক্ট কিাত ২৮ শে জুন থেকে ২৯ শে জুন, ২০০৯ পর্যন্ত সময়টিকে "সাধু পলের বর্ষ" হিসেবে ঘোষনা করেছেন। সাধু পলের জন্মের দু'সহস্রতম জয়ন্তী বার্ষিকী পালনের উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ বর্ষের ঘোষনা। ঐ সময়ে বিশ্বজনীন মন্ডলীর সকল সদস্য/সদস্যগন সাধু পলের জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় এবং ঘটনাবলী পর্যালোচনা ও অনুধ্যান করে তাদের জীবনকে খ্রীষ্ট বিশ্বাসে ভরপুর করতে ও সে বিশ্বাস তাদের দৈনন্দিন জীবনে পালন করতে অনুপ্রেরনা পাবেন।

সাধু পলের বিশ্বাসী ও সাক্ষ্যময় জীবনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলেন স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট। প্রাথমিক জীবনে পল, যখন তাঁর নাম ছিল শৌল, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন করলেও, পরবর্তী জীবনে তিনি যীশুর দর্শন লাভ করে খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ও প্রচারক হয়ে উঠেন। তাঁর ব্যক্তিগত ও অন্যান্যদের জীবনে স্বর্গীয় পিতার শত আধ্যাত্মিক আশির্বাদের সমারোহ দেখে তিনি মুগ্ধ ও তন্ময় হয়ে পড়েন। যীশু খ্রীষ্টের ধরায় আগমনের উদ্দেশ্য যে আমাদের সকলের মুক্তির জন্যেই তা উপলব্ধি করে তিনি এই মঙ্গল বার্তা প্রচারে ব্রতী হলেন।

পোপ মহোদয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা যদি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সাধু পলের বর্ষ পালন করি, তাহলে প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পুণ্যতম জন্মতিথির তাৎপর্য্য আমরা শুধুমাত্র বাহ্যিক আনন্দ ও সাজসজ্জার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সত্যিকারভাবে তা বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে এবং আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তা প্রতিফলিত করতে পারব। সাধু পলের বর্ষে আমাদের প্রার্থনা হলো এ'বছরের বড়দিন ও আসন্ন নববর্ষ যেন আমাদের জন্যে শত আশির্বাদ বয়ে আনে, যার মধ্য দিয়ে আমরা স্বর্গীয় পিতার যোগ্য সন্তানরূপে সাক্ষদান করতে পারব।

"তেপান্তরী" পত্রিকার সকল পাঠক/পাঠিকাদের জানাই পুণ্যময় বড়দিন ও শুভ নববর্ষের আনন্দ ও শান্তিপূর্ন শুভেচ্ছা। মঙ্গলময় ঈশ্বরের আশির্বাদে আপনাদের জীবন সর্বদা সুখময় হোক, এই প্রার্থনা ও শুভেচ্ছান্তে -

ফা: ষ্টান্‌লী গমেজ (আদি)

শুভেচ্ছা বানী

ক্রিসমাস ডে যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন হিসেবে পালিত। সকল খ্রীষ্টভক্তগন স্মরন করেন কালের পূর্নতায় স্বয়ং ঈশ্বর মানুষরূপে তথা যীশুখ্রীষ্ট রূপে এই পৃথিবীতে অবতীর্ন হলেন **(Incarnation)** যোহন ১ : ১–১৪।

তিনি এসেছিলেন যেন পাপে পতিত ও শৃংখলিত মানবকুলকে মুক্তকরতে পারেন। পরিত্রান দিতে পারেন। তাইতো বিখ্যাত চিন্তাবিদ **Roy Lessin** এর উক্তির যথার্থতা মেলে :

"Our greatest need was forgiveness,
so God sent us a Saviour."
For unto you is born this day -----
a saviour, which is Christ the lord
Merry Christmas and a glorious happy new year to all of you.
God Bless!

Rev. James S. Roy
Senior Pastor
United Bangali Lutheran Church

শুভেচ্ছা বাণী

জগতের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শুভজন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েসনের উদ্দোগে "তেপান্তরী" পত্রিকা প্রকাশনার প্রয়াসকে স্বাগত জানাই। আমি আশা ও বিশ্বাস করি যে, এ পত্রিকাটির মাধ্যমে প্রবাসি বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সমাজ এই উন্নত দেশে বাঙ্গালী জাতির কাছে প্রভু যীশুর আগমনের উদ্দেশ্য তুলে ধরতে সক্ষম হতে পারবে। সকল প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সমাজের ভাইবোনদের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলছি, আসুন সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বাইবেলের নিরাময় সত্য শিক্ষা আমাদের প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবের কাছে তুলে ধরি এবং বড়দিনের আনন্দ সফল ও সার্থক করে তুলি। আপনার জীবনে বড়দিন হউক একটি সুন্দর, সফল ও অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা।

"উঠ, দীপ্তিমতী হও, কেননা তোমার দীপ্তি উপস্থিত, সদাপ্রভুর প্রতাপ তোমার উপরে উদিত হইল। কেননা, দেখ, অন্ধকার পৃথিবীকে ঘোর তিমির জাতিগনকে, আচ্ছন্ন করিতেছে, কিন্তু তোমার উপরে সদাপ্রভু উদিত হইবেন, এবং তাঁহার প্রতাপ তোমার উপরে দৃষ্ট হইবে। আর জাতিগন তোমার দীপ্তির কাছে আগমন করিবে, রাজগন তোমার অরুনোদয়ের আলোর কাছে আসিবে।" যীশাইয় ৬০: ১-৩ পদ। কেন আজ খ্রীষ্টান সমাজ ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত? তা কি শিক্ষার অভাবে না দারিদ্রতার কারনে? আমি বলব কোনটাই না। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, যদিও খ্রীষ্টান সমাজ শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার বেড়াজাল থেকে অনেকটা বেড়িয়ে এসেছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সফল ভূমিকা রাখছে। তবুও আমার মনে হয় যেন আমাদের মধ্যে কোথায় যেন একটা সীমাবদ্ধতা এবং মতভেদ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমেরিকার মত উন্নত বিশ্বে থেকেও যদি এ মতভেদ থাকে তা অবশ্যই আমাদের প্রতিবেশী সমাজের কাছে একটি লজ্জার বিষয়। আমি মনে করি, ভালবাসা, সহমর্মিতা, একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব অনুশীলন এবং ধর্মান্ধতা ও হিংসা পরিহার করে এ সীমাবদ্ধতার অবসান ঘটিয়ে একটি সতন্ত্র ও প্রগতিশীল বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সমাজ প্রতিষ্ঠা করি। যীশু বলেন, "আমি জগতের আলো"। যোহন ৮:১২পদ। তিনি আরও বলেন. "তোমরা জগতের আলো"। মথি ৫: ১৪পদ। আসুন আমরা তাঁর আদর্শ সন্তান হিসাবে বড়দিনের আনন্দকে সমোন্নত রাখি এবং মাদের জীবনে খ্রীষ্টের সত্যিকার আলোর শীখা তুলে ধরে খ্রীষ্টের জন্মের অর্থাৎ বড়দিনের সত্যিকারের আনন্দ আমাদের জীবনে ও কাজের মাধ্যমে অন্যের কাছে তুলে ধরি।

পবিত্র শাস্ত্র এই কথা বলে, "তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন কার্য্যকরী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই ——— ২ তীমথিয় ২:১৫পদ। প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের সকল কর্মকর্তা ভাই-বোনদের উৎসাহ দিয়ে বলছি, ঈশ্বর আপনাদের তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে পরিচালনা করুন। আপনাদের সদিচ্ছা ও সেবা করার মনোভাবের জন্য আমি আমার প্রানঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। ঈশ্বর আপনাদের জীবনে সফলতা দান করুন এবং প্রচুর ফুলে ও ফলে পরিপূর্ন করুন।

'বাংলা বাইবেল চার্চের' পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই বড়দিনের অনাবিল আনন্দ ও শুভেচ্ছা। পরম করুনাময় পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁর প্রেমের বন্ধনে আপনাদের আবদ্ধ রাখেন। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন ও সুস্থ্য রাখুন।

রেভা: টমাস এম রায়
পালক: বাংলা বাইবেল চার্চ।

শুভেচ্ছা বানী

খ্রীষ্টেতে প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

শুভ বড়দিন ও নববর্ষের মহা আশির্বাদের দিনগুলিতে ত্রানকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনাদের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রদান করুন।

আসুন আমরা তার মহা পরিত্রান গ্রহন করি। যে পরিত্রান প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সমগ্র মানব জাতির জন্য সাধন করেছেন এবং জীবন পুস্তকে আমাদের নাম লিপিবদ্ধ করি।

পাষ্টর জেমস সমীরন বৈরাগী
ফার্ষ্ট বাংলা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, নিউ ইয়র্ক

শুভেচ্ছা বানী

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম উৎসবে প্রবাসী বাঙ্গাঁলী খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সোহর্দ্যতা ও মিলন বার্তার ঢালী নিয়ে তেপান্তরী'র বিশেষ সংখ্যা কলেবরে প্রকাশিত হওয়া আমাদের এ প্রবাস জীবনের এক অনবদ্য ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দা ও শত প্রতিকুলতা সত্ত্বেও এ প্রচেষ্টা প্রবাসী বাঙ্গাঁলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের বহি প্রকাশের সফল উদ্যোগ।

আমাদের জন্মের মুল, মাটি ও মানুষের সানিধ্য হতে বঞ্চিত সুন্দর এ প্রবাসী জীবনে নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা, ভাষার লালন ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের অবলম্বনস্বরূপ প্রবাসী বাঙ্গাঁলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ও সোর্স এন্ড সলিউশনস যেন একই বৃন্তে দু'টি ফুল। এ ফুলের সুবাস আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়কে করুক নির্মল, বিকশিত হউক আমাদের জাগরন, উদ্ভাসিত হউক আমাদের মধ্যকার প্রীতি ও ভালবাসা। উন্মুক্ত হউক সফলতার নয়া দিগন্ত।

প্রভু যীশুর এ জন্মতিথিতে সোর্স এন্ড সলিউশনস ইনক এর পক্ষ হতে সকলের প্রতি রইল শুভ্র বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা।

ডেরিক পিনেরো
প্রেসিডেন্ট
সোর্স এন্ড সলিউশনস ইনক্

Some American Holiday Traditions

Jerry Gerald Gomes

Christmas' Santa Claus

If Christmas is about celebrating birth of Christ- then who is Santa Claus? Where does his story come from?

The story of Santa Claus and him bringing gifts for the children is entirely a western tradition. Story of Santa Claus became popular among the children many centuries ago and it certainly boosts their enthusiasm for the wonderful Christmas Eve and for the gifts they receive. But the story of Santa Claus does not have any religious significance for Christmas which is actually the celebration of birth of Christ.

Santa Claus or Saint Nicholas- also known as Father Christmas is a Western folklore about a bishop who lived in ancient Eastern Roman Empire (which included today's Turkey and Greece).

The story of Santa Claus came from the European ancestors who first immigrated to this land. It came from Dutch Sinterklass- which in turn is derived from the story of Sint Nicolass (Saint Nicholas) of Eastern Roman Empire.

Saint Nicholas of Myra (in modern-day Turkey) is the primary inspiration for the legendary figure of Santa Claus. He was a 4th century Christian bishop in Myra. He was known for his generosity for giving gifts- especially to the poor children during the time of Christmas.

Dutch Sinterklaas was Americanized into Santa Claus but soon it lost its' bishop's apparel and was pictured as a thick-bellied Dutch sailor with pipe in a green winter coat. Modern version of American Santa Claus came after a poem published in December 23- 1823. The name of the poem was 'A Visit From St. Nicholas' (better known today as 'The Night Before Christmas') which was published in Sentinel-Troy- New York- which depicted Santa Claus as a heavy set individual with eight reindeer. Later an American cartoonist Thomas Nash published such a picture of Santa Claus in 1863. Image of Santa Claus was further publicized by Coca-Cola Company in their advertising.

An American poet named Katherine Lee Bates in 1889 created the character Mrs. Claus and later in twentieth century the story of Rudolph the eed-nosed Reindeer was added as the lead ninth reindeer pulling Santa's sleigh.

Legends say- Santa Claus lives in the North Pole where everything is covered with white snow and very cold. All year Santa is busy making toys for the children and reading the letters he gets from the children. He finally comes by flying through the sky riding his sleigh pulled by the reindeer making jingling sound. He then sneaks in every house through the chimney (too bad if you do not have a chimney!!) and places all the wonderful gifts wrapped in colorful wrapping paper under the Christmas Tree (of course only for the ones who have been good throughout the year).

Christmas time in the United States is very colorful. Streets and shopping malls are decorated. Everyone gets busy decorating the house with lights- putting up Christmas tree and hanging ornaments on the tree. Radio stations play Christmas music all day and night starting weeks before Christmas. School children go around the neighborhood for Christmas caroling. People start attending Christmas parties with friends- co-workers and relatives within weeks after thanksgiving holidays and goes until New Years celebration. Parents line up in shopping mall with their little toddlers to take pictures with Santa Claus. Kids' imaginations go wild about Santa Claus coming from the North Pole in his sleigh pulled by the reindeer. Children write letters to send to Santa Claus for the gifts they want and wait until Christmas Eve- keeping wonderful expectation in heart for Santa to come through the chimney.

Of course some parents do tell story of baby Jesus' birth in Bethlehem on a manger; which is why we actually celebrate Christmas.

The controversial aspect of Santa Claus story is that many devout Christians think this takes away the focus of Christmas from celebration of Jesus' birth. Many others argue that it is not such a good idea for the parents to lie to children about Santa Claus. Good part of it is that the children really have good time imagining all kinds of stories about Santa and the gifts they think they receive from him. Oh- by the way- at the end of January parents get a surprise statement from the credit-card company and Santa has nothing to do with it!

Thanksgiving Turkey

How and when did the celebration of Thanksgiving Holiday start?

In 1621- European settlers of Plymouth colony in Massachusetts and Native American Indians shared an autumn harvest festival of food praising God and being thankful for nature's bounty which became a symbol of cooperation and interaction between English colonists and Native Americans and known as the first Thanksgiving celebration. The pilgrims boarded the ship Mayflower for

America- arrived and established Plymouth colony in Massachusetts in 1620-1621. The first winter was harsh and many of these early settlers died in the first year of arrival. Then they learnt new farming techniques from the local Native Americans and the harvest of 1621 was bountiful.

Although the celebration of 1621 is known as the very first Thanksgiving- is was actually a continuation of harvest celebration for appreciating and to be thankful to the nature for its bounty. Native Americans in this land used to celebrate harvest to show gratitude for nature's bounty- perform ceremonial dances since much before the arrival of the Europeans in North America.

Therefore to be precise- if anything- Native Americans and Early settlers started the tradition by giving thanks to nature and to Almighty God respectably.

Historians do not have any accurate account of menu that was actually served in the first celebration for Thanksgiving feast. The most detailed description of the "First Thanksgiving" comes from Edward Winslow from A Journal of the Pilgrims at Plymouth- in 1621 where he mentioned wild fowl as the main item for Thanksgiving feast at Plymouth celebration.

Historians have cited other celebration of such as the one by Berkley's Plantation near Charles River- Virginia and also by the English settlers in Colony of Virginia near Jamestown; where it is noted that they pledged Thanksgiving to God for their healthy arrival in America after a long voyage across Atlantic.

How the fourth Thursday of November was chosen for Thanksgiving:

Though Thanksgiving has been celebrated every year since the pilgrims did (or the Native Americans did- however you see it)- the first President George Washington called this a national celebration to be observed on 26th day of November every year through prayer of thanks to God. President Abraham Lincoln declared last Thursday of November as the Thanksgiving celebration and a national holiday. In 1941 US congress has set the fourth Thursday of November every year as the Thanksgiving celebration.

How "Thanksgiving" is celebrated today:

Today- Thanksgiving is celebrated to give thanks for everything we are thankful for throughout the year.
Thanksgiving is the biggest family event for the American people and a secular holiday tradition. Family members usually gather in one place- usually in their parent's house or one of family-members' house. Even the ones- who are unable to or usually do not visit family members during Christmas time- make their best effort to be together during Thanksgiving holidays. A traditional Thanksgiving meal together with all the family members is the part of the main celebration of Thanksgiving. Turkey meat is the main attraction of Thanksgiving meal. Along with turkey- ham- stuffing- mashed potatoes- gravy- sweet potatoes (yam)- cranberry sauce- green bean casserole- corn- turnips- dinner rolls- pecan or pumpkin pie are some of the main traditional dishes for Thanksgiving meal. There is also a Thanksgiving Day parade.

Canadians also celebrates Thanksgiving but on a different day (in October) and also based on a separate (Canadian) historical context.

New Year's Eve Lighted-Ball Drop

How did New Year's Eve lighted-ball drop become a tradition?

Americans began celebrating New Year's Eve in Time Square- New York City as early as 1904. But in the year 1907- a ball made of wood and iron lighted with 100 of 25 watt bulbs which was 5 feet in diameter and weighed 700 pounds was dropped from a flag pole at midnight in front of One Time Square. Since then it has become a tradition. The ball- the pole and dropping celebration went through many changes since then.

Recently- in the year 2000- for new millennium celebration- the ball was designed through Waterford Crystal weighed 1-070 pound and 6-foot in diameter. Since then- the ball has been a crystal one. In 2007 the electronics manufacturer Phillips replaced the halogen lighting on the ball with LED lighting. In 2008 it was further enhanced with LED lights with 16.7 million colors and special effects in order to celebrate the 100 years of ball dropping in Time Square. The crystal ball descents 77 feet over the course of 1 minute and comes to rest at the bottom of the pole at 12:00:00 AM.

New Years Eve is celebrated throughout the world. It is the final day of year according to Gregorian calendar and the evening before the New Year's Day. New Years Eve is celebrated with music- parties and gathering- drinking and dancing and socializing spanning the transition unto a new year at midnight. New Year's Day is a national holiday in the United States and a day of major social event. Families celebrate feasting- dining and wining- singing and dancing; while many people join theirs friends in banquet halls- clubs- restaurants and cafés for celebration. In America- among other hotspots- Time Square in New York City is the biggest attraction for New Years Eve celebration. At the tick of midnight- a huge lighted ball is dropped from above as

people cheer in joy embracing the joy and hope for the one more new year to come as they are celebrating outside in front of the Time Square. This wonderful event is broadcasted live throughout America so that people who celebrate at home can enjoy watching live on TV.

Easter Bunny

First of all let us make it clear that in Christian liturgy- Easter (or the Pascha or Resurrection Day) is an important religious feast. This day is celebrated with prayer and joy to remember the ascension of Jesus the Christ into heaven after his bodily death on earth.

In America often a folklore character of Easter bunny is associated with Easter celebration primarily for Children's amusement. Easter Bunny just like the Santa Claus does not have any religious significance. Easter bunny is a lovable huggable bunny rabbit (stuffed animal- toy character) that brings candy to the kids on Easter Sunday. Children play game around the house- in the yard or in the park looking for Easter eggs (supposedly Easter bunny's egg. Go figure!!)- which often contains candy or small toy.

Where does the Easter Bunny come from?

To make long story short- Easter Bunny comes from Germanic mythical folklore. In this folklore story Eostre was the name of the fertility goddess who in an attempt to heal a little bird- turned it into a bunny which then laid an egg to give her as a gift. Around the spring time when Christian church used to celebrate "Pascha" (ascension of Christ in heaven after resurrection)-it coincided with the month of "Eostur-monat" in ancient Germanic calendar named after Eostre. Therefore even after old Europe was evangelized with Christianity- people hold on to some of their ancient traditions and called the "Pascha" as Easter and kept the story alive of Easter bunny for children's amusement.

As I mentioned elsewhere- Easter bunny and the mythical story of ancient Eostre has nothing to do with Christianity- just like Santa Claus- Christmas tree- Mistletoe- Hallowing etc have nothing to do with the religion of Christianity. These are purely traditions that came from other ancient traditions and cultures.

Some modern apologists also present the argument that since Catholic church prohibited eating eggs (protein) during lent which of course used to be followed more rigorously in the past and was also enforced by the church- so after lent during Easter- eating eggs in abundance was a ritual. To me this argument is as much reliable as the story of the bunny!

Independence Day Fireworks

Independence Day celebrated on 4th July is America's Birthday. In the year 1776- on this day- the United States of America was born by declaring independence from the colonial power of Great Britain. This day commemorates the Declaration of Independence- authored primarily by Thomas Jefferson in 1776 in Philadelphia- Pennsylvania.

Even though 4th July is celebrated as America's Independence Day- Declaration of Independence was neither signed on 4th July- nor the act of declaring independence took place on that day; in fact it was not signed until late August that year. But it was generally agreed 4th July to be celebrated as the Independence Day since it was adopted by the congress on 4th July. The congress voted to declare independence from Great Britain on July 2 which was about a year after the beginning of American Revolutionary War against colonial power of Great Britain and adopted the Declaration of Independence on 4th July. Also even though Declaration of Independence took place in Pennsylvania- the state of Pennsylvania in fact voted against the independence (but 9 out of original 13 states voted for independence).

How did the Independence Day celebration start?

In 1777- thirteen gun salutes were fired to celebrate the Independence Day in Bristol- Rhode Island and it was celebrated in the following years in US as well. In 1870 US congress made Independence Day an unpaid holiday for federal employees. Finally in the year 1931 congress made Independence Day a paid national holiday.

How people celebrate Independence Day now:

People celebrate Independence Day with fireworks- parades- barbeques- picnics- concerts and games. Independence Day is celebrated throughout United States with patriotic displays and events. Fireworks of grand scale are often arranged near many metropolises. Many small communities and townships also arrange firework displays- street fair- music and other public events. Firework displays are often accompanied with patriotic songs such as national anthem ("The Star-Spangled Banner")- "God Bless America"- "America the Beautiful" etc.

Halloween

First and foremost Halloween is not a national holiday and it is not a religious celebration. Christianity as religion has nothing to do with celebration of Halloween. Halloween is a traditional celebration where children dress up in spooky dresses and go door to door to trick-or-treat to collect candies- decorate their yard with scarecrows- scary characters-

curved pumpkins- dried corns- haystacks- broomsticks- spider nets etc.

This is one of the most fun filled day for the children (and oh yes- for the candy sellers!). But this is also the most controversial tradition amongst more conservative and religious minded people. Halloween is celebrated on October 31 every year.

Where does the Halloween celebration come from?

European ancestors- as some articles suggest- Irish immigrants brought this tradition to America. This is the celebration after the annual harvest time. Scarecrow- dried corn-pumpkin and haystack all symbolize farming and harvest. But being scary- listening to scary stories or going to haunted house- decorating with broomsticks- witches- spider nets etc also are part of the tradition- because during this harvest fest- in pre-Christian time- people also used to celebrate spirits (unseen counterpart of body in non-religious term). I suppose by dressing up as or by seeing a witch- ghost or a spooky character- can take a lot of the scare away from within people's mind!

Though the modern name for this day derived from All Hallows' Even or All Saints Day which is a Christian feast- Halloween itself predates Christianity and was celebrated by pre-Christian era ancient Europeans as a harvest festival where they used to believe in both scaring away and also being scared by evil spirit during harvest festival

Does Halloween have religious significance?

No- Halloween does not have any religious significance. It so happened to be- Halloween is celebrated on the day before the liturgical celebration of Christian "All Saints' Day" (November 1) and two days before "All Souls Day" (November 2). But "All Saints Day" and "All Souls' Day" are entirely separate from it because Halloween is a secular traditions and fun filled harvest time celebration. Christian "All Saints' Day" and "All Souls' Day"- are celebrated by praying for the departed souls; these are the days of contemplation- not celebration- therefore total opposite of the purpose of Halloween. These holy days are about remembering the deceased and praying to God for their souls. Christianity sees God as good Spirit (or Holy Spirit)- though in Christianity bad spirit or evil spirit exists which is referred to as satan in the Holy Bible. In Christianity- evil spirit is never celebrated. "All Saints' Day" and "All Souls' Day" are to pray for departed souls of other deceased people and to pray to good Spirit which is God- not to celebrate bad spirit. Therefore Halloween has nothing to do with religion of Christianity or Christian faith or the church at all. (All Christian denominations respect Saints- though some do not accept that Saints can intercede (be mediator) for the people. This discussion is not in the scope of this article- therefore I'll skip. Despite any denominational viewpoint differences- all denominations agree that Halloween has nothing to do with religion of Christianity).

But most people find there is nothing wrong by getting into a different and/or spooky character and thus by having some fun for a day.

Valentine's Day Celebration

Where does Valentine's Day come from?

Valentine's Day is named after Saint Valentine. Though the day is named after a Christian Saint- the celebration itself has nothing to do with the religion of Christianity (its' scripture and doctrine). Surprisingly "Saint Valentine" refers to several martyred saints in ancient Rome. One of the Saint Valentine whose feast is celebrated on that day according to Christian liturgical calendar- was buried in Rome in February 14-

How Valentine's Day is celebrated:

Valentine's Day is celebration of love which is primarily celebrated by exchanging flowers- gifts- cards or wishes among the romantic partners such as husband and wife- couple engaged to be married- boyfriend and girlfriend- etc. Though Valentines Day is celebrated in many countries in the world- there are variations in how it is celebrated. For example in Norfolk- UK a character named Jack Valentine leaves sweets for the children at the door steps. In Wales- it is celebrated on January 15- in Romania February 24- in Finland and in places in South America like in Guatemala it is called Friendship Day- in Turkey it is called "Sweetheart's Day"- in Brazil it is celebrate in summer (June 12). In Japan gifts are often exchanged amongst co-workers on Valentine's Day.

Other Holidays and Important Days

Besides the above there are number of important holidays such as: Martin Luther King Day (3rd Monday in January)- President's Day (3rd Monday of February)- Memorial Day (Last Monday in May)- Labor Day (1st Monday in September)- Columbus Day (2nd Monday in October)- Veteran's Day (November 11)- Mother's Day (2nd Sunday of May)- Father's Day (3rd Sunday of June)- etc.

বড়দিনের রসময় শুভেচ্ছা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

প্রভু যীশুর জন্মদিন সকলের বড়দিন। এ আনন্দের দিনে আমরা সকলে একসাথে উৎসব করে থাকি। এই খুশীর দিনে– কৌতুক এবং রম্যরচনা দিয়ে– দিনটিকে আরও হাস্যময় করতে চাচ্ছি। বড়দিনে আমরা যেমন– সুস্বাদু খাবার দাবার খেয়ে থাকি- প্রীতিময় সামাজিকতা করে আড্ডায় মেতে উঠি- তেমনি হাসির কিছু খোরাক দিয়ে শুরু করছিঃ

১। দুই বন্ধু মোটর সাইকেলে যাচ্ছে। –
ঃ- এত জোরে চালাস নে ভাই- বড্ড ভয় লাগছে।
ঃ- তাহলে আমার মতো চোখ বন্ধ করে রাখ।

২। ১ম বন্ধু ঃ আমার সিংহের মুখোমুখি হওয়ার ঘটনাটি কি তোকে বলেছি?
২য় বন্ধু ঃ না! কি হয়েছিল রে?
১ম বন্ধু ঃ কী আর বলবো- সঙ্গে বন্দুকও নেই সিংহটা ও সমানে গর্জন করছে- আর এগিয়ে আসছে।
২য় বন্ধু ঃ হায় খোদা। তখন কি করলি?
১ম বন্ধু ঃ কেন- বানর দেখতে পাশের খাচাঁয় চলে গেলাম।

৩। শপিং মলে নির্দেশঃ সমস্ত জিনিস বুঝিয়ে লইবার পরই মলত্যাগ করিবেন।

৪। রোগী ঃ ডাক্তার সাহেব আপনি বলেছিলেন- চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে সর্বত্র যেতে পারব।
ডাক্তার ঃ হ্যাঁ বলেছিলাম- তা পারছেন তো?
রোগীঃ পারতেইতো হচ্ছে। আপনার বিল মেটাতে গিয়ে গাড়িটা যে বেচে দিতে হলো!

৫। খদ্দের ঃ তেলের সাথে যে ফ্রি গিফ্‌টা দেবার কথা- কই সেটাতো দিলেন না?
দোকানদার ঃ আজ্ঞে- এর সাথে তো কোন ফ্রি গিফ্‌ট নেই।
খদ্দেরঃ (হাসি হেসে) আমাকে খুব বোকা পেয়েছেন? এই তো বোতলের গায়ে লেখা কোলোস্ট্রেল ফ্রি?

৬। পার্কে পাশাপাশি বসে আছেন দু'জন। একজন অন্যজনকে বলল- কী দিনকাল যে এলো- আজকাল আর পোশাক আশাক দেখে চেনা যায় না ছেলে না মেয়ে- ওই যে মেয়েটিকে দেখেন। কে বলবে সে একজন মেয়ে!
– যে মেয়েটির কথা বলছেন ও কিন্তু আমারই মেয়ে।
– আমি দুঃখিত- আমি জানতাম না আপনি ওর বাবা!
– মাফ করবেন- আমি ওর বাবা নই- মা।

৭। পথিক ঃ কি ব্যাপার- গতকাল দেখলাম একটা থালা পেতে ভিক্ষা করছ আজ দুটো দেখছি যে?
- ভিক্ষুকঃ আপনাদের দয়ায় রোজগার ভালই হচ্ছে–তাই একটা ব্রাঞ্চ খুললাম আর কি!

৮। স্কুলে আগামীকাল পরিদর্শক আসবেন। তাই শিক্ষক ছাত্রদের বল্লেন "কাল তোরা ভালো এবং পরিস্কার জামা পড়ে আসবি।" পরদিন ছাত্ররা পরিস্কার আর সুন্দর জামা পড়ে এলো। কিন্তু ক্লাসে একজন কানা ছাত্র ছিল - সে ময়লা জামা পড়েই চলে এল । তাই দেখে শিক্ষক মহাশয় রেগে গিয়ে অন্যান্য ছাত্রদের বললেন "কানাডারে স্কুলের পিছনের পুকুর পাড়ের একটা গাছের লগে ভাল কইরা বাইন্দা রাখ।" ছাত্ররা তাই করলো। যথাসময়ে পরিদর্শক সাহেব আসলেন- তখন ভুগোল ক্লাস চলছিল- তাই তিনি একজন ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন "কানাডা" কোথায়? ছাত্রটি জবাব দিলো" – স্যার কানাডারে পুকুর পাড়ের একটা গাছের সাথে ভালো কইরা রাইন্দা রাখছি।

বলতো- একজন রাজনীতিবিদ আর একজন ডাকাতের মধ্যে পার্থক্য কী? – পারছি না। – ডাকাত- ডাকাতি করে জেলে যায়- আর রাজনীতিবিদরা জেল থেকে বের হয়ে ডাকাতি করে।

পরিশেষে- আমাদের দেশে একটি গণতান্ত্রিক- অসাম্প্রদায়িক সরকার কামনা করছি- তাহলেই দেশে শান্তি বিরাজ করবে। আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশের জনগণ যেন ঈদ- পূজা এবং বড়দিনের আনন্দ একসাথে উদযাপন করতে পারে। সন্ত্রাসী ও দুস্কৃতিকারিরা- কুলষিত রাজনীতিবিদরা যেন কোন অজুহাতে হাসপাতাল হয়ে বীরদর্পে সমাজে আবার প্রতিষ্ঠা লাভ না করে। জনগণ এক যুগান্তকারী মুহূর্তের সামনে দাঁড়িয়ে আছে- নতুন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যেন এবার- সেবা-র রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন- আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখতে চাই।

কৃতজ্ঞতায় ঃ নকুল মন্ডল এবং গাইজার আলী- সংগৃহীত কৌতুক সমূহ।

একটু ভেবে (অথবা - "না")

ডেরিক গোনছালবেছ

ভাত হোক কিংবা পোলাও- চা হোক কিংবা কফি- যে কোনো কিছু আহারের সময়ই নূন্যতম সহবত মেনে চলা উচিত। কিছু টিপস দেয়া হলো এই বিষয়ে.....

বড় হা করে খাবেন না।
খাবার চিবানোর সময় মুখ বন্ধ রাখবেন।
আওয়াজ করে খাবেন না।
মুখে খাবার নিয়ে কথা বলবেন না।
চা পানের সময় শব্দ করে চুমুক দেবেন না।
চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে খাবেন না।
এঁটো খাবার টেবিলে ফেলবেন না- আলাদা পে□টে ফেলুন।
টুথপিক ব্যবহারের সময় বাঁ হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে নিন।
এক সাথে অনেক ভাত পে□টে নেবেন না।
সারা হাত মেখে ভাত খাবেন না।
খেতে খেতে আঙ্গুল চাটবেন না।
সবার সামনে ঢেঁকুর তুলবেন না।
খাবার দেওয়া মাত্রই শুরু করবেন না।
অন্যদের জন্য অপেক্ষা করুন।
কোন খাবার নিতে দুরে হাত বাড়াবেন না।
দূরের খাবার প্রয়োজন পড়লে পাশের জনকে অনুরোধ করুন।
কোন কারণে খাওয়ার মাঝে উঠতে হলে 'একসকিউস মি' বলে উঠুন।

কথা বলায় স্মার্টনেস বজায় রাখুন
ডেরিক গোনছালবেছ
গলার স্বর ও বাচন ভঙ্গির দিকে খেয়াল রাখুন এবং ধীর ও স্পষ্ট ভাষায় বলুন।
অন্যের কথা বলার মাঝে কথা বলবেন না- বললে 'সরি' বলুন।
অন্যের কথা মন দিয়ে শুনুন।
কথা বলার সময় হাচি বা কাশি এলে 'একসকিউস মি' বলুন।
খেতে খেতে কথা বলবেন না।
জরুরী না হলে সকাল আটটার আগে ও রাত এগারোটার পরে ফোন করবেন না।
ফোনের কাছে কলম ও নোটপ্যাড রাখুন।
কথা বলার সময় লাইন কেটে গেলে তার দায়িত্ব আবার ফোন করা।
বাড়ীতে যারা কাজ করেন তাদের ফোন ধরতে শেখান।
কোন আড্ডায় বা অতিথির সামনে বেশী সময় ধরে ফোনে কথা বলা অনুচিত।পেট্রোল পাম্প- প্লেনে- জিমে- হাসপাতালে- গির্জায় ফোন বন্ধ রাখাই ভালো।

পিতামাতার মুক্তি কিসে এবং সন্তানের কর্তব্য কি

ছিরিল ডি রোজারিও

মানুষ হলো ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব এবং সেই হিসেবে ঈশ্বর হলেন আমাদের পিতা। তিনি প্রথমে যাদের সৃষ্টি করেন :- তারা হলেন আদম ও হবা। প্রথমে তাদেরকে স্বর্গরাজ্যে এদেন উদ্যানে রাখা হয়েছিল এবং ওখানে শুধুমাত্র একটি বৃক্ষের ফল ছাড়া সব কিছু ভোগ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল। শয়তানের প্ররোচনায় হবা প্রথমে ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খায় এবং পরে আদমও খায়। নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে তারা পাপ করে এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরুপ তাদেরকে স্বর্গ থেকে মর্ত্তে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই আদেশ দিয়ে – "তোমরা ফলবান হও এবং বংশ বৃদ্ধি কর।" সেই থেকে নারীপুরুষের মিলনের ফলে মানুষের উৎপত্তি আরম্ভ হয়। সেই জন্যই মানুষের জন্মদাতা - "পিতামাতা রুপে" - আখ্যায়িত এবং যারা জন্মগ্রহন করে - তারা হলো তাদের সন্তান। সব কিছু ঘটে ঈশ্বরের ইচ্ছনুসারে। সেইজন্যই ঈশ্বরের দশআজ্ঞার প্রথমআজ্ঞায় বলা হয়েছে - একমাত্র প্রভু ঈশ্বরকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসবে এবং পূজা করবে এবং দ্বিতীয় পিতামাতাকে মান্য করবে যাদের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে আসার সুযোগ লাভ করে। সেইজন্যই জন্মদাতা হিসেবে সন্তানকে লালন পালন করার দায়িত্ব পিতামাতারই - যার জন্য তাদেরকে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করতে হয় যে পর্যন্ত না সন্তান স্বাবলম্বী হয়- তাকে খাওয়াতে পরাতে হয়। শুধু তাই নয় - সন্তানকে মনুষ্য সমাজে মানুষ করে গড়ে তোলার দায়িত্বই হলো পিতামাতার যাতে অন্যেরা বলতে পারে উমুকের সন্তান মানুষ হয়েছে। সন্তান যাতে বিপথগামী না হয় - কোন পাপকার্য্য না করে - এবং রীতিমত ধর্মকর্ম করে - সেই দিকে পিতামাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। যদি সন্তান মানুষের মত মানুষ না হয়- যদি অসৎ হয় - তখন সব দোষ বর্ত্তায় পিতামাতার উপর যতই তারা ধর্মকর্ম করুক - দোষ থেকে রেহাই পাবেনা মৃত্যুর পরও। পিতামাতা যদি সেই দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন না করে - তবে তার মুক্তি নেই। সন্তানকে মানুষ করে গড়ে তোলাই হলো পিতামাতার মুক্তি। অন্যদিকে সন্তান মানুষ করা যেমন পিতামাতার দায়িত্ব- তেমনি পিতামাতাকে ভরণ পোষন করা বিশেষ করে বৃদ্ধকালে পিতামাতাকে সেবা করাও সন্তানের কর্তব্য। সন্তান যদি উহা না করে- পিতামাতা তখন অবশ্যই মনে কষ্ট পায়। বৃদ্ধকালে পিতামাতা অনেকটা হয়ে উঠে শিশুর মত। জন্মের পর সন্তানের পরম সহায় পিতামাতা - আর বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হলো পিতামাতার একমাত্র সহায়। এই অবস্থায় সন্তান যদি পিতামাতাকে যথাযথভাবে দেখা শোনা না করে- তখন পিতামাতা নিজেকে বড়ই অসহায় মনে করে - যার ফলে পরিবারে অশান্তি বিরাজ করে। পিতামাতা যাতে মনে কষ্ট না পায় এবং খাওয়া - পরায় কোন অসুবিধে না হয়- সেইদিকে সন্তানের দৃষ্টি রাখা উচিত। বর্তমানযুগে বিশেষ করে আমেরিকায় পিতামাতার প্রতি সন্তানের বড় বেশী চিন্তা-ভাবনা নেই - যার ফলে এখানে বৃদ্ধকালে অনেক পিতামাতা হোমে থাকে। কাজ করার ক্ষমতা থাকলে কাজ করে। অনেকে কাজ করার পরিবর্তে - যে সমস্ত চার্চে ফ্রি খাবার প্রদানের ব্যবস্থা আছে - সেখানে ভীড় জমায়। বৃদ্ধকালে যারা কাজ করে- তারা খুশীমনে কাজ করে না - মনে কষ্ট নিয়েই কাজ করে - যখন নিজের সন্তান থেকে ভরণ পোষণ পেতে বঞ্চিত হয় - এর প্রমান পাওয়া গেল এক সাদা ট্যাক্সি চালককে খুবই বৃদ্ধ অবস্থা দেখে - যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় - তিনি কোন দেশের নাগরিক এবং কোন ছেলে সন্তান আছে কিনা - উত্তরে তিনি বললেন - তার মা বাবা বিগত দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় ইটালীর সিপিলি দ্বীপ থেকে এদেশে এসেছেন এবং তার জন্ম হয় নিউইয়র্কে। এক ছেলে আছে - সে ডাক্তার। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করি - ছেলে কি তাকে কোন সাহায্য করে না - তখন তিনি আমার দিকে এক করুণ দৃষ্টিতে তাকায়ে শুধু বললেন - "This is America" তিনি অন্তরে কত বেদনা নিয়ে এই কথা বললেন - তা বুঝতে আমার কোন কষ্ট হলো না। এইতো হলো এখানকার অবস্থা। অন্যদিকে বাংলাদেশে সাধারনত বৃদ্ধকালে পিতামাতাকে ভরণ পোষণ এবং সেবা করাই হলো - বাঙ্গালী জাতির কৃষ্টি। আমরা বাঙ্গালী যারা এদেশে আমেরিকায় বসবাস করছি- তাদের উচিত বাঙ্গালীর সেই কৃষ্টি ধরে রাখা এবং সেভাবে জীবন যাপন করা - তবেই পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। যে সমস্ত সন্তান পিতামাতার সহিত যে ভাবে আচরন করবে পরবর্তীকালে তাদের সন্তানও তাদের সাথে সেই আচরণই করবে - এর ভুরি ভুরি প্রমান আমাদের সমাজে রয়েছে। সুতরাং ছেলেমেয়ে মানুষ না করলে - যেমন পিতামাতার মুক্তি নেই- তেমনি পিতামাতাকে ভরণ-পোষন না করলে- ঐ পরিবারে শান্তি নেই। অতএব পরিবারের স্বার্থেই পিতামাতাকে সেবা ও শ্রদ্ধা করা সন্তানের একান্ত কর্তব্য।

কথায় বলে বিশ্বাসে ভগবান

বার্নাডেট তিলু গমেজ

এ সুন্দর পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হওয়াটাই ভাগ্যের ব্যাপার। শৈশবকাল থেকে প্রকৃতির কি সুন্দর ও বিচিত্র দৃশ্যই না দেখতে পাচ্ছি। ভাল-মন্দ- সুখ-দুঃখ- হাসি-কান্না- আনন্দ-বেদনা নিয়েই মানুষের জীবন। আর এরই মধ্য দিয়ে জীবনের অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছি। সংসার জীবনের অ-নে-ক অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছি। দয়াময় প্রভুর আশীর্বাদে যে অবস্থায় আছি খুব ভাল আছি- আনন্দ ও শান্তিতে আছি। প্রভুকে সর্বান্তঃকরনে ধন্যবাদ জানাই।

মানুষ মরণশীল। জন্মের পর তার মৃত্যু হবে-ই। এটাই চিরন্তন সত্য। জীবন মানে সংগ্রাম। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করেই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। সেজন্য থাকতে হবে ধৈয্য ও সহ্য শক্তি। Allways be Patient- মানুষ একা চলতে পারে না। তার একজন 'সঙ্গী' দরকার- আর তাকে সাথে নিয়ে সুখ-দুঃখ- হাসি-কান্না- আনন্দ-বেদনা এর মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করতে হয়। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনে বড় অশান্তি- নানা রকম সমস্যা। পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে- এই যে ভাঙ্গন- এই যে অশান্তি এর মীমাংসা তো আমাদেরই করতে হবে। ইচ্ছা থাকলে উপায় বের করা যাবে-ই। আমাদের বিভিন্ন পরিবারে অনেক জ্ঞানী-গুনী- ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে- তাদের কথা ও উপদেশ (Advice) মেনে চলে আমরা নিজেদের পরিবারে সমস্যার সমাধান করতে পারি। এজন্য থাকতে হবে ইচ্ছা ও চেষ্টা- আর তাহলেই আমরা পরিবারে আবার পূর্বের শান্তি ও আনন্দ ফিরিয়ে আনতে পারব এবং শান্তি ও আনন্দে একত্রে বসবাসও করতে পারব।

আমাদের জীবনে প্রার্থনারও একান্ত প্রয়োজন। Prayer is Power শত ব্যস্ত তার মধ্যে থেকেও সময় করে বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করলে দয়াময় প্রভু আমাদের মনোবাসনা পূরন করবেন-ই। তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। তিনি তো বলেছেন- "তোমরা চিন্তা করো না- নিরাশ হয়ো না- চেষ্টা করো- আমি তো তোমাদের সঙ্গেই আছি।" তিনি আরও বলেছেন- "তোমরা কোন বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না- অস্থির হয়ো না- আমাতে বিশ্বাস করো।"

প্রার্থনাপূর্ণ জীবন ও অধ্যবসায় বয়ে আনে জীবনের পূর্ণতা। প্রার্থনাই শক্তি সঞ্চয়ের উত্তম পথ। নোবেল বিজয়ী Alexis Correl বলেছেন- "Prayer is the strongest form of generating energy."

সাধু আগষ্টিন বলেছেন- "যে ভাল গান করে- সে দু'বার প্রার্থনা করে।" "The family that - Prays together- Stays together."

জগতের ইতিহাসে আদর্শ দাম্পত্য জীবনের মহান প্রতীক সাধু যোসেফ খ্রীষ্টিয় পরিবারে অনুকরণীয় প্রতিপালক ও আধ্যাত্মিক পরিচালক। আদর্শ দাম্পত্য জীবনযাত্রা নিমিত্ত পর্যাপ্তরূপে ঐশ্ব কৃপাশীষ লাভ করে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করেও আমরা ফল পেতে পারি। নাজারথের পবিত্র পরিবারের গুন ও আদর্শগুলো যথা- ভালবাসা- শান্তি- ক্ষমা- বিশ্বাস ও আনন্দ যেন আমরা আমাদের পরিবারে ও অনুশীলন করতে পারি। পারিবারিক জীবনে রোজারি মালা প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম। মা মারীয়ার প্রতি প্রার্থনা আমাদের বিশ্বাসের ভীত যেমন শক্ত করবে- বাস্তব জীবনেও হতে পারব সুখী।

আমরা প্রার্থনা করি - হে পরম করুণাময় পিতা- আমাদের পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সাহসের সাথে মোকাবেলা করতে তুমি আমাদের শক্তি দান কর। আমরা সবাই যেন তোমার মত সবাইকে ভালবাসতে ও ক্ষমা করতে পারি। সাধ্যমত একে অন্যের কল্যাণে অবদান রাখতে পারি।

"Lord- make us turn to you- Let us see your face and we shall be saved."

The Road to Sunset

Blin Gonsalves

Life is all about time. Twenty- forty- sixty - and age keeps catching up with us. Life essentially- is regressive in nature. It take back what it gives unto us. The ways of life are not fair. Verily- a human baby arrives in the world with a cry. Yet it is endowed with the most precious thing in God's world – the human spirit. It is this spirit that finds hope in disappointment- duty in distress- and sees light in the sunset. Every part of life has its own charms. The human baby finds love in its mother's bosom. It is the sweetness of this sensation that inspires us to engage in the pursuit of joy and happiness. We discover love and the denial of love. The toddler takes the first step and utters and the first word. It is the blissful state of human life. The baby- as it grows- understands its importance- and understands well into youth that these are the golden times of our lives. Nostalgia becomes a lifelong trait. By and by we become what we are. As the baby comes of age it understands that there has to be an effort for everything. A judgment to stand up to- an accountability to answer. Some plod through life- some become the children of wrath-
and some become heroes. It is the time that sees the birth of the spirit of enterprise and the power of the will. The many experiences they encounter- the many trials they face- make them or break them. For our friends our faces do not change. We remember each other by our faces well into our old age. Such friends of youth are the gems of our lives and remain a lifelong enchantment.

It is grace that adds beauty and sense to life- whether one is twenty or sixty or be it eighty. The gifts we bring into life- however- bloom in youth. It is vitality that endows it with freshness. But the many gifts of youth decline with age. Be it beauty- vigour or mental sharpness. The loss hurts in more than one way- socially- professionally- mentally and- indeed- physically. Nostalgia compounds the despair -- in situations when the aging drop out- or in its extremity- are shut of the mainstream. Every age has its share of woe. It is not only the aging who are traumatized by circumstances of life. "If men are sensible and good-tempered- old age is easy enough to bear: if not youth as well as age is a burden." Many- therefore- say that grace that goes with wisdom comes with age. Aging is part of life- as youth is. The brooding or the lamentation that comes with aging is afraid that there is little left. Wonder lies the sunset where death is waiting for its prey. It is not death but dying- with its many forms of suffering- that is dreaded. Death is our destiny. It is natural that the aging learn to live with the thought of death. When it comes- it robs remorselessly. Death will come when it will come. It is not only the aging and the old whom it hunts. An angle of a child is lost to leukemia. A young bride is run-over by bus in front of her of her house. A teenage girl is lost to human beasts. The only difference is that they did not see it coming. But the old and the aging see it coming.

The human spirit does not succumb but carries on with the many duties of life- with the joys that bloom around and the many pursuits that invite. It is the pride in the human spirit that keeps the effort alive. The duties are many- to the family- to the society- and to the country. To speak of the joys of life they are always in bloom for the eyes that seek. The human spirit is the greatest of all virtues. The journey is the business of eternity. They thrive well that celebrate and cherish the human spirit. Let the sunset come when it will come.

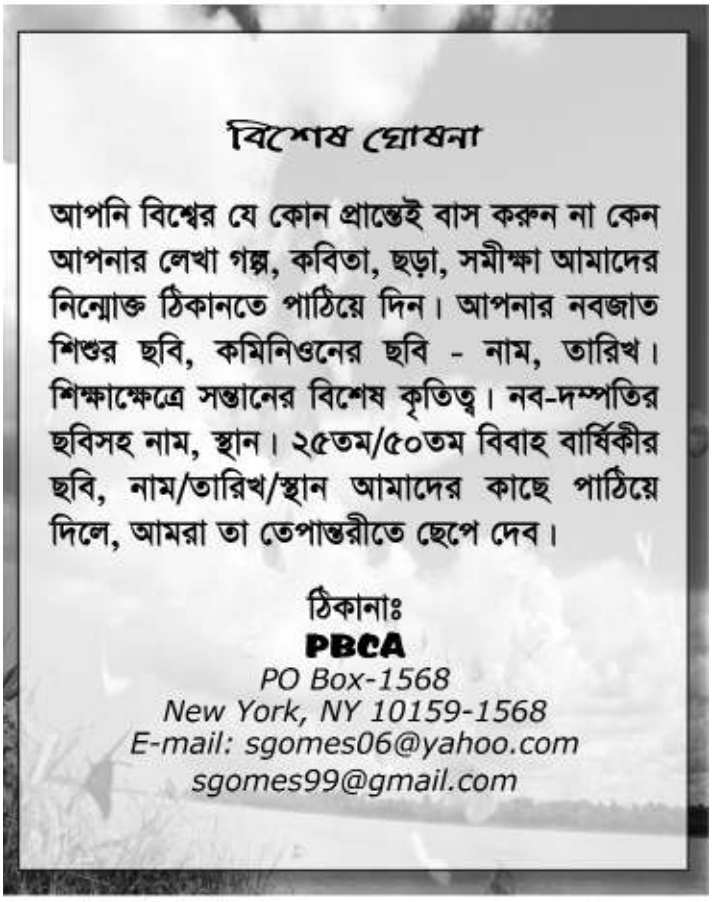

রাজার প্রশ্ন এবং তার উত্তর

নিকোলাস শৈলেন অধিকারী- ক্যালিফোর্নিয়া

অনেকদিন আগে বিখ্যাত একটা গল্প পড়েছিলাম। সবটুকু স্মরণে নেই। তবে আসল তথ্যটুকু উপভোগ্য হবে বলে বিশ্বাস করি। এক রাজা ছিলেন। তার ছিলো বিচক্ষণ মন্ত্রী পরিষদ- অন্তরংগ পাত্র-মিত্র- সুযোগ্য সিপাহী। দেশে কোনো অভাব নেই। প্রজারা সুখেই দিন কাটাচ্ছে। চুরি-ডাকাতি- ঝগড়া-ফ্যাসাদ খুব কম। তাই বিচারালয়ে রাজাকে বেশী বসতে হতো না। অন্য কোনো রাজা তার দেশ আক্রমন করতে আসতো না। তিনিও তার রাজ্যের সীমা বাড়াবার প্রয়োজন মনে করতেন না। তবুও রাজার মন মানছে না। কেবলই উস্‌খুস্‌ করেন। অস্বস্তিকর একটা চিন্তার পোকা মাথায় ঘোরাফেরা করে। অনেক সময় অনেক প্রশ্ন মাথায় আসে। কিন্তু তার উত্তর খুঁজে পান না। একদিন দরবারে এসে রাজা বললেন- চারিদিকে উপবিষ্ট পরিষদবৃন্দের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। তারা আমাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করে আসছেন। আমার মাথায় তিনটা প্রশ্ন ঘুরুপাক খাচ্ছে। আশা করি আপনারা তার উত্তর দেবেন। কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়? কোন্‌ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়? কোন্‌ কাজটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়? দরবারের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে কেউ মাথা চুলকান- কেউ মৃদু কাশি দিয়ে গলা পরিস্কার করেন- কেউ এদিক থেকে ওদিকে তাকান। ভাবটা এই-অন্য কেউ প্রশ্নের উত্তর দিক। নিঃশব্দে সময় চলে যায়। পিন্‌ পতন নীরবতা। চেয়্যার ছেড়ে ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে প্রধান মন্ত্রী বললেন-মহারাজ- অভয় দেন তো একটা কথা বলি। কেউ কিছু বলছেন না। ধরে নিতে হবে তারা উত্তর জানেন না। এমনকি উত্তরগুলো আমারও জানা নেই। আপনার রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে একটা বন আছে। তার সীমানার কাছেই একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বৃদ্ধলোক একা থাকেন। তার সহজ সরল জীবন-যাপন- তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কথা অনেকেই জানে। আমার মন বলছে একমাত্র তিনিই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। পরদিন রাজা দুইজন দেহরক্ষী নিয়ে- নিজে সাধারণ বেশ পরে ঘোড়ায় চড়ে বনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সারাদিন পরে বিকেল বেলা বনের কাছে এলেন। দেহরক্ষী দুজনকে সেখানে অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিলেন। ঘোড়া রেখে পায়ে হেঁটে ঐ বৃদ্ধের সাধারণ একটা কুটিরের সামনে এলেন। ঘরের মধ্যে কারও সাড়া পাওয়া গেলো না। এদিক ওদিক তাকাতে দেখলেন স্বাস্থ্যবান বৃদ্ধ লোকটি বাগান পরিচর্যা করছেন। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললেন- আমি এই দেশের রাজা। কিন্তু আমার মনটা অশান্ত। আপনার বুদ্ধি- বিচক্ষণতা সম্বন্ধে শুনে আমি আপনার কাছে এসেছি। আমার তিনটা প্রশ্ন আছে। কোন্‌ জিনিসটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়? কোন্‌ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়? এবং কোন্‌ কাজটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়? আশা করি আপনি অনুগ্রহ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাকে জানাবেন। যতোক্ষণ রাজা কথা বলছিলেন বৃদ্ধ তার দিকে না তাকিয়ে একমনে মাটিতে গর্ত খুঁড়ছিলেন। গর্তে গাছের চারা লাগানো হবে। রাজা কথা থামালে তিনি বললেন- আমার মনে হচ্ছে- গর্ত খুঁড়তে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন। রাজা তার কথা মতো হাঁটু গেড়ে গর্ত খোঁড়ার কাজে লেগে গেলেন। কাজের মধ্যে একটা কথাও বললেন না। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেলো রাজার দুই দেহরক্ষী পলাতক। এক সিপাহীকে বন্দী করে কুটিরের দিকে আসছে। রাজার কাছে এসে একজন বললো- মহারাজ- এই লোক আপনার শত্রু। এর পিতা ছিলেন আপনার অধীনস্থ সেনাপতি। প্রজাদের উপর অত্যাচারের জন্য আপনি তাকে সাবধান করে দিলেও তিনি সতর্ক হননি। পুনরায় প্রজাপীড়নের জন্য তিনি বরখাস্ত হন। তার পুত্র এই পলাতক সিপাহী আপনাকে মেরে ফেলতে এই কুটিরের দিকে যাচ্ছিলো। আমরা তাকে বন্দী করেছি। বন্দী করজোড়ে মাটিতে উপুড় হয়ে বললো-- মহারাজ- আমার পিতার অপমানের জন্য আমার মাথা ঠিক ছিলো না। আমার মধ্যে এক পশুর জন্ম হয়েছিলো। আপনার মতো দয়ালু ও প্রজাপালক রাজার প্রাণ নিতে এসে আমি ভীষণ অন্যায় করেছি। অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করুণ। রাজা দেহরক্ষীদের বললেন- ওকে ক্ষমা করলাম। ওকে মুক্ত করে দাও। কিছুক্ষণ পরে কুটিরের বারান্দায় বৃদ্ধ ও রাজা বিশ্রাম করছিলেন। বৃদ্ধ রাজাকে বললেন- আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন।- কীভাবে? আমাকে বুঝিয়ে বলুন।- আপনি যখন আমার কুটিরে এসে আমাকে গর্ত খুঁড়তে সাহায্য করেছেন- ঐ সময়টা হলো সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। আমার কথা না শুনে- আমাকে সাহায্য না করে- আপনি যদি একা চলে যেতেন- তবে আপনার শত্রু আপনাকে পথেই হত্যা করতে পারতো। কারণ আপনার দেহরক্ষীরা অনেক দূরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলো। তাই আমিই হচ্ছি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি- যার কথা আপনি শুনেছিলেন। মাটি খুঁড়তে আপনার বেশ কষ্ট হচ্ছিলো। তাই গর্ত খুঁড়তে আপনার সময়ও বেশী লেগেছিলো। আমার সাথে মাটি খোঁড়ার কাজটাই আপনার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় কাজ ছিলো। পরের ঘটনাও বুঝিয়ে বলছি। দেহরক্ষীরা যদি পথের পাশে অপেক্ষা না করে অন্যদিকে চলাফেরা করত যেতো- তাহলে আপনার শত্রু নির্বিঘ্নে এখানে এসে আপনার যাত্রাপথে আপনার ক্ষতি করতে পারতো। দেহরক্ষীদের ঐ সময়ে ওখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সময়। আপনার শত্রুকে কাবু করে বন্দী করা আপনার দেহরক্ষীদের কর্তব্য। ঐ সময় আপনার শত্রুই হলো সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। আর বুঝতেই পারছেন- লোকটাকে পরাজিত করে বন্দী করে ফেলার কাজটাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ।- শেষ ঘটনার বিশ্লেষণ এইভাবে হতে পারে। ঐ লোকটা অনুতপ্ত হয়ে যখন ক্ষমা চাইলো- সেই সময়টা হচ্ছে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় সময়। আপনি এখানে না থাকলে ঐ লোকটার জীবনে অনুতাপ বা পরিবর্তন আসতো না। অতএব- তার কাছে আপনি হচ্ছেন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। পুরাতন এক শত্রুকে ক্ষমা করার কাজটা হচ্ছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ।- এক কথায় বলতে গেলে- বর্তমান সময়টা- এবং আমি যার সংগে আছি সেই ব্যক্তি- এবং আমরা দু'জন যে কাজ করছি- এই তিনটি বিষয় সকলের জীবনে অতি মূল্যবান ও প্রয়োজন।- মহারাজ- আমার এখানে আজ রাতে থাকুন। খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রাম করুন। কাল সকালে রাজধানীর দিকে রওনা হবেন। রাজা খুশী হলেন। পরদিন সকালে দুই দেহরক্ষী ও ক্ষমাপ্রাপ্ত বন্ধুকে নিয়ে বিজ্ঞ বৃদ্ধকে বিদায় জানালেন। গল্প এখানেই শেষ। ঐ তিন প্রশ্নের তিন উত্তরের মতো বলছি। ধরুন আমি। আমি আপনার সাথে আছি। কিন্তু এই আপনাকে বিশিষ্ট বা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হিসাবে দেখছি না। দেখছি বা বিচার করছি এমন এক ব্যক্তির মতো যাকে সমালোচানা করা যায়। তারপর- অকাজের কাজ পরনিন্দাই প্রধান কাজ হয়ে উঠেছে। আর বর্তমান বাদ দিয়ে অতীত ঘাটছি বেশী। অতীতের "পাঁক" নিয়ে দলা দলা পাশে ছুঁড়ছি- উপরে ছুঁড়ছি।তারপর বিভিন্ন দেশের অবস্থা তো আরো করুণ। প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান যুগ। ইতিহাস- ভূগোল- জলবায়ু- পদার্থ ও রসায়ণ বিজ্ঞান- নৃতত্ত্ব ইত্যাদি ঘাটলে দেখা যেতে পারে অভাবনীয় পরিবর্তন। সেটা হচ্ছে ভাঁঙ্গা-গড়া-ভাঁঙ্গার খেলা। দেশ ভেঙ্গে টুকরো হয়ে নূতন দেশ হচ্ছে। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও ওমনি গড়া-ভাঁঙ্গা। তাজমহল গড়ে ওকে খাড়া রেখে শা'জাহানের প্রেম চারশত বছর অমর হয়ে আছে। আবার খারাপ প্লানিং ও বাজারের রদ্দা মাল-মশলার জন্য ব্রিজ- ওভারব্রিজ- স্টেডিয়ামের প্রেস বক্সের ছাদ ভেঁঙ্গে জীবন-হানি ঘটছে। ডলার-টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে। কারণ এক লক্ষ থাকলে এক কোটি চাই। এক মিলিয়ন থাকলে একশ মিলিয়ন চাই। আমরা গড়ছি- কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী গড়ার মতো গড়ছি না। তবু কিছু কিছু সময় কোনো কোনো মানব-মহামানব আমাদের মধ্যে এসে- কিছু কাজ করে- আমাদের আশার বানী শুনিয়ে গেছেন। বুদ্ধ- শ্রীচৈতন্য- গুরু নানক- হজরত মুহাম্মদ- বিবেক-রবি-নজরুল-এরা মানুষের প্রতি ভালবাসার কথাই বলেছেন। ত্রিশ থেকে ত্রেত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত এই তিন থেকে চার বছর অকল্পনীয় কাজ দিয়ে যিনি জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন তিনি নাজারতের যীশু বা "য়ুশুস' বা "ম্যাস্যায়া"। তাঁর জীবনের কর্মক্ষেত্রে তিনি অসংখ্যা লোকের কাছে গিয়েছেন। যে সময়ের দরকার ছিলো ঠিক সেই সময়েই তিনি অন্ধের কাছে- খঞ্জের কাছে- হাত-পা-অবশ-হওয়া লোকের কাছে- প্রদর-রোগে-ভোগে স্ত্রীলোকের কাছে- লাসারের কাছে এসেছেন। প্রত্যেককে বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে বেছে নিয়ে অলৌকিক এবং মানব-দরদী কাজ করেছেন। প্রেম- সেবা বিলিয়েছেন। ঈশ্বরকে জীবনের প্রথমে রেখে- আমাদের কর্তব্য করে- মানুষকে ভালবেসে- আমাদের দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর জীবনকে সুখময় করতে পারি। কারণ আমাদের জীবন- জলের বুদবুদের মতো। কেবল "কোথায় আছি" এ-চিন্তা সব সময় না করে "কে ছিলাম" এবং "কোথায় ছিলাম"- তা-ও যেনো প্রতিদিন ভাবি। আমরা চাই- তিনি দেন। তিনি দিলে প্রতিদানে কিছু দিতে হবে-তা ভাবি কি? আসুন কবি রাজনীকান্তর ভাষায় ঈশ্বরকে বলি- "আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাও নি। যা দিয়েছো তারি অযোগ্য ভাবি-য়া কেড়েও তো কিছু নাওনি।" আমাদের প্রার্থনার সুর হবে এমনি। তুমি আমার অযোগ্যতা জেনেও আমাকে কম দাওনি। অনেক দিয়েছো। দিয়ে আবার কেঁড়েও নাও নি। তোমাকে ধন্যবাদ। নিজের আলো নিজের চোখে পড়লে নৌকার মাঝি-মোটর গাড়ীর ড্রাইভার সামনের পথ দেখতে পায় না । নিজের দিকে ফেরানো আলো বন্ধ করে- আলোকে সামনের দিকে মেলে ধরলে জীবনের পথ চলতে সুবিধাই হবে। সেই আলোতে দেখা যাবে হাজার হাজার মুখ। তারা আপনাকে দেখছে। আমাকে দেখছে। আমাদের দেখছে। তাদের হাতের ব্যানারে জিজ্ঞাসার চিহ্ন (?)। তার উত্তর আপনার কাছে। আমার কাছে।

নিজে বাঁচি দেশ ও জাতিকে বাঁচাই

শান্তিলতা রায়

নবীদের কিতাব: দানিয়েল ৪:৩০-৩৩ এই সমস্ত বাদশাহ বখতে নাসারের উপরে ঘটল। বারোমাস পরে তিনি যখন ব্যাবিলনের রাজবাড়ীর ছাদে বেড়াচ্ছিলেন- তখন বললেন- "আমার মহাশক্তির দ্বারা এবং আমার জাঁকজমকের গৌরব প্রকাশের জন্য রাজধানী হিসাবে যেটা আমি তৈরী করেছি একি সেই মহান ব্যাবিলন নয়? কথাগুলো তার মুখে থাকতেই বেহেশত থেকে কেউ বললেন- হে বাদশাহ বখতে নাসার তোমাকে বলা হচ্ছে যে- তোমার রাজ্য তোমার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। তোমাকে লোকদের কাছ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং তুমি পশুদের সঙ্গে বাস করিবে এবং ষাঁড়ের মত তুমি ঘাস খাবে। যে পর্যন্ত না তুমি মেনে নেবে যে- আল্লাহতালা মানুষের রাজ্যেগুলোর উপরে কর্তৃত্ব করেন- এবং সেই সব রাজ্য যাকে ইচ্ছা তাকে দেন সেই পর্যন্ত সাত বছর চলে যাবে।" বখতে নাসারের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল তখনই তা পূণ্য হল। মানুষের কাছ থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল এবং তিনি ষাঁড়ের মত ঘাস খেতে লাগলেন। তাঁর শরীর শিশিরে ভিজতে লাগল- তাঁর চুলগুলো ঈগল পাখির পালকের মত হয়ে উঠলো- আর তাঁর নখগুলো পাখীর পায়ের নখের মতো হয়ে গেল।

দানিয়েল ২:২১- তিনি সময় ও ঋতু তাঁর অধীনে রাখেন এবং তিনি বাদশাহদের সিংহাসনে বসান ও নামিয়ে দেন। সুতরাং যখনই আমরা দেশ পরিচালক মনোনয়ন করি- ধর্মপুস্তকের এই কথাগুলো যেন স্মরণে রাখি এবং বিশ্বাস করি যে- সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করলেন তখন তাকে মানব সমাজে ফিরিয়ে আনলেন।

নবীদের কিতাব কিবলে দেখি-"১ শমুয়েল ২:৬৭ মাবুদই মারেন এবং মাবুদেই বাঁচান- তিনি কবরে নামান আর তিনিই সেখান থেকে তোলেন। মাবুদেই মানুষকে ধনী বা গরীব করেন- হ্যাঁ তিনিই নীচু করেন আর তিনিই উঁচু করেন। অনেক সময় আমরা অল্প স্বার্থের জন্য দেশের জন্য অমঙ্গল ডেকে নিয়ে আসি। দেশের ও দশের জন্য যাদের কোন দয়া দরদ নাই তাদের সমর্থনকারী হয়ে তাদের পরিচালক মনোনীত করি।

নবীদের কিতাব মেসাল বলে "২৯:২ বাদশাহ সোলায়মান সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলেন- "আল্লাহভক্ত লোকদের সংখ্যা বাড়লে লোকে আনন্দ করে- কিন্তু দুষ্ট লোক শাসনকর্তা হলে লোকে কাতরায়"। অনেক সময় বাংলাদেশেও এ ঘটনা ঘটেছে। মানুষ না খেয়ে মারা গেছে কিন্তু শত শত মন চাল গুদামজাত অবস্থায় নষ্ট হয়ে গেছে। হয়ত শীতে- বৃষ্টিতে ভিজে বিভিন্ন অবস্থায় ভুগে মানুষ মারা গেছে। গরীবের সাহায্যের টিন লুকিয়ে রেখে যারা বড়লোক হতে চায়- গরীবের খাবার- কাপড়- জনগণের সুযোগসুবিধা উপভোগের অর্থ লুকিয়ে রেখে বড়লোক হতে চায় তারা কখনই দেশকে ভালবাসেনা। দেশকে ভালবাসার প্রতিফলন হবে দেশের জনগণের প্রতি লক্ষ্য রেখে জনগণকে সকল রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের শান্তিতে বাস করতে দেওয়া। যিনি তাদের নেতা হবেন- তাকে হতে হবে মায়ের মত। মা যেমন তার প্রতিটা সন্তানের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। অবাধ্য বলে তাকে বিনষ্ট করেন না- বরং ভাল পথে ফিরবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এটাই তার কর্তব্য হওয়া উচিত। নবী আরও বলেন- "মা" তার পরিবারের আচরণের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। আমার ছেলে 'ডাকাত' আর মা হয়ে আমি জানবনা- এটাত কখনও হতে পারে না। তাই নবীগণ আরও বলেছেন- যে ঘর শাসন করতে না জানে- সে কেমন করে সমাজ- মন্ডলী বা দেশ শাসন করতে পারে? নিজেই নিজের প্রশ্ন করি- যার মধ্যে থাকবেনা মায়ের সেই গুণাবলি - সে কিভাবে দেশের পরিচালক হতে পারে?

মুখোপেক্ষাঃ

অনেক সময় আমরা বাহ্যিক দৃশ্যাবলী দেখে মানুষকে বিচার করি- ভালমন্দের তারতম্য করতে পারি না- অথবা সামান্য স্বার্থের বশবর্তী হয়ে মন্দকে ভাল বলি। কিন্তু আমাদের সৃষ্টিকর্তা অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। আমরা দেখি তাঁর বিচার কেমন।

৫ম সিপারা ঃ প্রেরিত ১২ঃ২১-২৩- তখন হেরোদ একটা দিন ঠিক করলেন । তিনি সেই দিনে রাজপোশাক পরে সিংহাসনে বসে সেই লোকদের কথা বলতে লাগলেন। তাঁর কথা শুনে তারা চিৎকার করে বলল- " এ দেবতার কথা মানুষের নয়"। হেরোদ আল্লাহর গৌরব করেনি বলে তখনই মাবুদের একজন ফেরেশতা তাকে আঘাত করলেন- আর ক্রিমির উৎপাতে তিনি মারা গেলেন। আমরা যখন ভালমন্দের বিচার করি ও সমর্থন করি- তখন আমাদের অন্তরদৃষ্টি খুলে ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলেই যেন সমর্থন করি। দেশে এখন মনোনয়নের সময় এসেছে- যিনি সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি- যার মধ্যে রয়েছে সততা- ধৈয্য- ক্ষমাশীলতা- সহনশীলতা ও ভালবাসা তাকে মনোনয়ন করুন।

শিক্ষাঃ

শিক্ষাই মানুষকে নত করে- গাছ যেমন ফল ধারন করলে তার শাখা প্রশাখাগুলো নীচে নেমে যায়; শিক্ষাও মানুষকে দয়াশীলতা- ধর্মশীলতা- নত- নম্র- ক্ষমাশীলতা প্রদান করে। একজন অশিক্ষিত লোক অকাতরে পশুর মত চরিত্র ধারণ করে মানুষকে হত্যা করতে পারে। মানুষ দুঃখ কষ্টে অভাবে ও অনাহারে থাকলে তাদের জন্য তার অন্তর কাঁদে না- সে নিজের স্বার্থ নিয়ে নিজে বেঁচে থাকতে চায়। এহেন লোকদের নিকট থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত।

ধ্বংসলীলাঃ

কেন দেশে ধ্বংস আসে। যেমন পিতামাতা খারাপ হলে তাদের সন্তানেরা সেই প্রকার হবে অনিবার্য; দেশের শাসনকর্তা যদি খারাপ হন- তার সহপাটিরাও সেই প্রকার হয়। দেশে মারামারি- হানাহানি অবিরত থাকবে। আল□াহ পবিত্র এবং এহেন অবস্থার মধ্যে তিনি থাকতে পারেন না। তিনি যেমন জাতি সৃষ্টি করে ছিলেন যারা মানুষ তাদের নির্মান প্রযুক্ত তিনি অনুশোচনা করেছিলেন এবং জলপ্লাবন দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস করেছিলেন। তারপর সাদুম এবং আমুরার লোকজন এত দুষ্ট ছিল- একমাত্র "লুত" তার পরিজন ধার্মিক ছিলেন। তাদের দেশ থেকে বাহির করে রক্ষা করলেন। পরে অগ্নিগন্ধক ঢেলে দিয়ে সেই দেশ ধ্বংস করলেন। অনেক সময় বিজ্ঞানীদের নিকট থেকে বিভিন্ন সতর্ক সংকেত শোনতে পাই যেমন বাংলাদেশে একটি বড় ধরনের ভূমিকম্প হবে অথবা ঘূর্ণিঝড় আরও অনেক বিপদ সংকেতও থাকতে পারে। দেশের পরিচালক যদি ভাল হন তাহলে প্রজারাও ভাল হবে- এ ধরনের বিপদ দেশ থেকে দূরে থাকবে। আমরা কিছু সময় হযরত ইউনুসের সময়ের কথা আলোচনা করি। উত্তরদিকের সবচেয়ে শক্তিশালী বাদশাহ দ্বিতীয় ইয়ারাবিমের রাজত্বকালে আশোরিয়ার রাজধানী নিনেভ শহরের লোকজন খুবই দুষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই মাবুদ ইউনুস এর উপরে এই নজেল হল; তুমি সেই বড় শহরে নিনেভে গিয়ে তার বিরুদ্ধে তবলিগ কর- কারণ তার লোকদের খারাপ আমি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু ইউনুস স্পেন দেশে পালিয়ে যাবার জন্য একটি জাহাজে উঠলেন। তার এই ভুলের জন্য মাবুদ সেই সমুদ্রে একটি জোর বাতাস পাঠিয়ে দিলেন। ইহাতে সমুদ্রে ভয়ংকর ঝড় উঠল। নাবিকেরা জাহাজ বাঁচাবার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন। ভারী মালপত্র ফেলেও দিতে লাগল। সকলে নিজ নিজ দেবতার নামে কান্নাকাটি করতে লাগলেন।কিন্তু ইউনুস জাহাজের খোলে নেমে ঘুমাচ্ছিলেন। ক্যাপ্টেন অনুসন্ধান করে দেখলেন ইউনুস ঘুমাচ্ছেন। ক্যাপ্টেন তাকে জাগালেন- বললেন- "তুমি কেমন করে ঘুমাচ্ছ- উঠ তোমার দেবতাকে ডাক- এবং তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বুঝতে পারলেন তার পাপের জন্য এই বিপদ। সেইজন্য গুলিবাট করে দেখলেন তার ভাগ্য উঠেছে। এই বিপদময় মুহূর্তে ইউনুসকে জিজ্ঞাসা করা হল; সমুদ্র যাহাতে শান্ত হয় সেই জন্য আমরা তোমাকে নিয়ে কি করব? উত্তরে তিনি বললেন- "আমাকে তুলে সমুদ্রে ফেলে দিন তাতে সমুদ্র শান্ত হবে"। যাদিও এই লোকটিকে সমুদ্রে ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল- তবুও তাই করতে হল। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের তোলপাড় বন্ধ হয়ে গেল। মাবুদ একটি বৃহৎ মাছ প্রদান করলেন- সে তাকে গিলে ফেলল। তিনদিন- তিনরাত সেই মাছের পেটে থেকে তিনি মাবুদের নিকট মুনাজাত করতে থাকেন। পরে মাবুদ মাছটাকে হুকুম দেন আর মাছটা ইউনুসকে শুকনা জমির উপরে বমি করে বের করে দিল। আর মাবুদ আবার তাকে বললেন নিনেভেতে যাও এবং আমি যে খবর তোমাকে দেব সেখানে ঘোষণা কর। মাবুদের কথামত ইউনুস নিনেভেতে গিয়ে তার একপাশ থেকে অন্য পাশে হেঁটে সমস্ত জায়গায় যেতে তিনদিন সময় লাগল- সেই সমস্ত দিন এই সব কথা ঘোষণা করলেন। "আর চল্লিশ দিন পরে নিনেভ ধ্বংস হয়ে যাবে। এই খবর পৌঁছালে পর- রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে রাজপোশাক খুলে ছালার চট পরে গায়ে ছাই মেখে বসলেন- এবং একই সঙ্গে রাজকর্মচারী ও যত লোকছিল- এমনকি পশু- গরু- ছাগল- ভেড়া- সকলের জন্য রাজা এই আদেশ দিলেন- মানুষ এবং পশু চট পরুক আর কিছু পান আহার না করুক। যথাশক্তি দিয়ে আল্লাহকে ডাকুক আর খারাপ কাজ ছেড়ে দিক। কেজানে হয়তো বা আল□াহ মন ফিরিয়ে এই ধ্বংস থেকে রক্ষা করবেন। আর ঠিক তাই হল মানুষের অনুশোচনা দেখে আল্লাহ সেই ধ্বংস আসতে দিলেন না। প্রিয় বন্ধুগণ- আমরা দুইটি দেশের লোকদের বিবরণ শোনালাম। একদেশ তাদের খারাপ কাজ চালিয়ে গেল যার জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। অন্য দেশটির রাজা এবং তাঁর প্রজারা তাদের পাপের জন্য অনুশোচনা করল ঈশ্বর তাদের রক্ষা করলেন। আর আজ আমাদের সুযোগ রয়েছে দেশকে রক্ষা করার ও নিজেদের রক্ষা পাবার। আমরা যদি এমন লোককে মনোনয়ন দ্বারা নিযুক্ত করি যার মধ্যে রয়েছে সমস্ত প্রকার মন্দতা ; তিনি ক্ষমতা লাভ করলে দেশ মন্দতার দিকে এগিয়ে যাবে। তখনই ঈশ্বরেরই শাসন দেশের উপর নেমে আসবে। দেশ ও জনগণকে বাঁচান যাবেনা। বাদশাহ সোলায়মান যে শিক্ষা রেখেছেন ঃ মেসাল ১৭ঃ১৫ যারা দোষীকে নির্দোষ বলে ধরে- আর যারা নির্দোষীকে দোষী করে তাদের উভয়কেই মাবুদ ঘৃনা করেন। কিন্তু ন্যায্য বাটখারাতে তিনি সুখি হন। মেসাল ১২ঃ২ যে শাসন ভালবাসে সে জ্ঞান ভালবাসে কিন্তু যে লোক সংশোধনের কথা ঘৃণা করে সে পশুর সমান।

নির্বাচনের সময় এগিয়ে এসেছে। আমরা যেন অতি সতর্কতা অবলম্বন করি। "সাবধান নিজের পায়ে নিজের কুড়াল না লাগাই।" দেশ ও জাতি রক্ষা করা- নিজে রক্ষা পাওয়া এইটি আমাদের বিশ্বস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। "মানুষ অভ্যাসের দাস" যে দায়িত্ব হাতে পেয়ে দেশের ক্ষতি সাধন করেছে- দেশের জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে নিজে বড়লোক হয়েছে- বাড়ি গাড়ি সোনাদানা টাকার পাহাড় গড়েছে- ভালো মানুষগুলোকে অর্থের লোভ দেখিয়ে চোর- গুন্ডা- খুনি বানিয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন বিপন্ন করছে- যার পরামর্শে দেশের অনেক গণ্যমান্য ভাল মানুষগুলোর প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে। এহেন লোক দেশের পরাজিত শত্রু। এ ধরনের লোককে সমর্থন দিয়ে পরিচালক করার থেকে অসমর্থনকারী হয়ে ঘরে বসে থাকা দেশের জন্য মঙ্গলজনক। আমরা একটু চিন্তা করি কতভাবে দেশের ক্ষতি হয়- দেশের বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক দেশের সম্পদ- ধার্মিক লোক দেশের মহাসম্পদ যাদের দোয়ায় দেশ বাঁচে। তাদের যদি ধ্বংস করা হয় দেশের মহাক্ষতি। আর এই ক্ষতি হয়ত ভালমনের মানুষগুলোকে ঘুষ দিয়ে এই অপকর্মগুলি ঘটান হয়। আর লোকদের এই ধরনের অপরাধে আল্লাহ একদিন দেশকে ধ্বংস করতে বাধ্য হবেন। প্রিয় বন্ধুগণ আসুন- আমরা আমাদের জ্ঞানকে সুচারুরুপে ব্যবহার করে একজন উপযুক্ত প্রার্থীকে মনোনীত করি যার ফলে দেশ- জাতি এবং আমরা সকলে বাঁচি।

একাগ্রতার অগ্রাধীকার

ডেভীড সরকার- স্টেটেন আইল্যান্ড- নিউইয়র্ক

সাইমনদার পাওয়ানা ধন্যবাদ তোলা থাকলো। ওটাই আমার পুঁজী- সুদে আর আসলে যোগ হতে থাক। ধার করে বা কর্জ রেখে পুঁজী বাড়ানো- এই আর কি। সম্ভব। যদি ধারের ধকল সওয়া যায়। লিখবো লিখবো শুধু ভাবি- লিখবো- কিন্তু কি লিখবো? কিভাবে লিখবো তা তো ভাবতেও পারি না ? কারণ মনের ইচ্ছা যে লিখবো শুধু সেটুকুই বড় হয়ে বেরিয়ে আসে কিন্তু Product বলতে যা দরকার তাতো আর আসেনা। দিন যেটা গেলো ভালোই গেলো। কিন্তু আজকের অবস্থা অনেক ভিন্ন। নিজের গন্ডি ছোটো করেছি আর সীমিতো-সংকুচীতোও হয়েছি অনেক অভাবে-যাকগে-আজ আর সে সব মন গড়া কথা না বলে বরং মনের দু একটা "মনের" কথা দিয়ে Fuzzy Math তৈয়ারি করবো। ঠিক মত তৈরী করতে না পারলেতো গোমড় ফাঁক হোয়ে যাবে। তাই Grace Period এর সাথে পুরো তিন ঘন্টাই চেষ্টা করে যাব। আমাদের Former Vice President Al Gore যখন White House এর দিকে দৌড়াচ্ছিলেন তখন বিরোধী বিজ্ঞাবান Now My President Bush শ্লেশাত্বক উক্তি করেছিলেন- "গোরের সব তত্ত্বই যেন কেমন Fuzzy Math" পরে অবশ্য Gore এর সম্মানে Celebration-Reception Party দিয়েছিলেন ওই White হাউজের বর্তমান President Bush- ওটা হয়েছিলো Gore যখন Noble পুরস্কার পেয়ে ভাগাভাগি করে নিলেন এক Indian Dr. RK Pachauri এর সঙ্গে। আমার ভগ্নীপতি Prodip এর অসামান্য পরামর্শে International বাংলা ভাষায় Type করবার মত সাহস (মূলধন বা পুঁজী) যখন হলো তখন ভাবিছ Prodip কে ধন্যবাদ দিয়ে ওর পাওয়ানা (Balance Due) চুকিয়ে দেব এবং নিজে নিজেই Text তৈয়ারি করবো। এখানে আর ধার নয় পুরোটাই পুঁজি। সরাসরি Investment। মানুষের বানানো শহরের মানুষের আর বিধাতার বানানো গ্রামের মানুষের Income এ ভালো করে নজর দিলে অনেক বড় বড় পার্থক্য ধরা পড়বে। গ্রামের মানুষের ব্যয়ে- ব্যাবসা বাণিজ্যে প্রভাব তেমন একটা না পড়লেও- আমরা শহুরেরা এবং গ্রামে রেখে আসা আপনজনের ভোগ বিলাসিতায় বাজারদর বণিক শ্রেণী দখল করে নেয়। ভোগান্তী বাড়ে উৎপাদনের সঙ্গে যারা সরাসরি সম্পৃক্ত (কৃষক সমাজ) -তাদের। আজকাল ভাগ বন্টনও আর আগের মত হয়না। আগে Kitchen Plate এর সংখ্যা বেশি ছিলো আর এখন Account Head বেড়েই চলেছে। এখন মালিকই খেতে পায়না। মা আর হিম্‌শিম খাবেন কোথা থেকে? Birth Control হয়েছে? এখন চাই চাহিদা Control- হয়ত কিছু একটা হবে। এখন কাল এমন কালই হয়েছে যে খাবার বাসনেও থাবা বসিয়েছে। Wooden Dust Powder এক সময় জ্বালানির অভাবে Alternative Solution হিসাবে South East বিক্রয় এবং ব্যাবহার হত। Note করার বিষয়- আমাদের মনটার মত চুলোটাও বড়- তাই কাঠের গুঁড়িও লাগতো- বেশি। ডাল মাছ ভাত রান্নার পরেও লম্বা সময় ধরে ঐ দামী জ্বালানী Alternative Solution জ্বলে জ্বলে অভাবের সময়েই অপচয় হত। আগুন নিয়ে খেলা? অপচয়ই হোক-দরকার নেই। ভাবুক মন ভাবো তো একবার-ঐ মন থেকেই তো "চাহিদা" তৈয়ারী হচ্ছে। আর এই "চাহিদা মনকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময়ে প্রভাবিতও করছে। করুক-করে চলুক। আমরা তো আর White House-এর দিকে দৌড়াছিনা- আমরা তো Finish Line এর দিকে দৌড়াছি। আত্মবিশ্বাসী- সজীব সয়ংসম্পূর্ন হওয়া এবং হতাশায় দুরোদৃশ্যটি হারানো এক কথা নয় বরং বিপরীতমুখী। প্রশ্ন হচ্ছে "চাহিদা" গুলো কি Productive নাকি Non Productive? প্রিয় মনের "চাহিদা" গুলো কি Lia-bilities বাড়িয়ে দেবে? নাকি প্রিয় মনের "চাহিদা" গুলো এমন ভাবে প্রবাবিত করবে যে কাঠের গুঁড়ির আগুনে পুড়িয়ে জীবনকে Hell করে দেবে? যা কিনা জঠর জ্বালাকেও হার মানায়। আজকাল খবর খুঁজলেই বেরিয়ে আসে "খাদ্য" সমস্যা। খাদ্য সমস্যার অন্তত দু'টো দিক (version) আছে। High Tech Version এর দিকে এগুলে আমার ভাবনাটা খুলতে সহজ হবে। খাদ্যের বাজার ঠিক রাখতে কৃষক চাষ করলো Corn আর Soybeans. যে শ্রমিক ক্ষুদায় মরছে সে নিজেই Corn আর Soybeans কিনে নিয়ে গেল Motor Fuel-Ethanol বানাতে। ক্ষুধার রাজ্যে চলছে মটর গাড়ি আর শুকাচ্ছে পেটের গাড়ী- ধেয়ে চলছে একে অন্যের বিপরীতে। এখানেও বিপরীত মুখিতা দেখতে পাই। দু'টো Product এরই Demand High কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরবো। Government নিজের প্রয়োজনেই ঝুঁকে পড়েলা শ্রমিকের দিকে। Demand আরও High হয়ে গেলো। আর এদিকে খাদ্য ঘাটতি চরমে- আর দাম আসমানে। বুদ্ধীজীবিরা আঁতকে উঠবেন- বললেন Ethanol কোনে স্থায়ী সমাধান নয়। কে শোনে কার কথা? 2005 সংসদে Bill Pass হয়ে গেলো- Ethanol বানাতে এবং Corn আর Soybeans চাষ করতে Federal Government অনুদান- ভুর্তকী- আর বিনে পয়সার উৎসাহ সব দেবে- দিচ্ছেও। শুধু একটু বাড়তি Tax শ্রমিক কৃষক - জনগণ দেবে এই আর কি। Result হল Price and Tax দু-দুটো Plus- ভালোই। আমার মা রেগে বলেন- আমার পাড়া টুকানো স্বভাব আছে। কিন্তু ভেঙ্গে বলেননি এটা ভালো না মন্দ। কি বলবো বলুন? তখনি বাড়তি অনেক কিছু শিখেছি আবার খেতেও শিখেছি কাঁচা কলার ছোলা দিয়ে টিকিয়া- গভীর বিলে ডুব দিয়ে শাপলার শিকড় তুলে ভেতরের সাদা অংশ দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ছিঁড়ে বের করে নিয়ে খাওয়া- আহ কি দারুন মজা! আর সঙ্গে যদি আবার ডুব দিয়ে চিংড়ী একটা ধরা যায় তাহলোতো কথাই নেই। এক হাতে সাঁতার কাটা আর অন্য হাতে চিংড়ী ধরে লেজে কামড় দিয়ে টেনে রের করে ওভাবেই খেয়ে নেয়া- ওই স্বাধ আর আনন্দ ভুলে থাকলেতো আমার বলতে আর কিছু থাকলোনা। কাঁচা কাঁঠালের কচি বিচি খেতে গিয়েতো আমার বুড়ো আঙ্গুলই টুকরো করেছি। রান্না ঘরের বড় পিতলের চামচে চর্বীযুক্ত মাংস বসিয়ে কাঠের উনুনের ভেতর টেলে দিয়ে পুড়িয়ে (Well-Done) খাওয়া। আরেকবার কিছু Fisherman দের সাথে Line-up করে পদ্মা-মেঘনা মাজদরিয়ায় জীবন্ত ইলিশ খাওয়ার Adventure। সূর্য্য মামা ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই শেষ করে দেখি চাঁদনি বুড়ী- শুকতারার সাথে মাথার উপর হাসছে- এ কি সদাসদ জ্ঞান? । বিন্দালু আর ভাজাকারী Capital Reform এর জন্য যে কত উপকারি তা আমার পাড়া-প্রতিবেশী সবার সাথে আনন্দে আর প্রত্যাশায় তোলা থাকল। তাই যা বলতে চেয়েছি বলি- Garden of Eden এ আমার Big and Great Great Grand ma তার Step Pet এর থেকে যখন ভীষণ স্বাধের স্বাধ পেল- পরিনতি কি হল? কারিগড় এর সুজলা সুফলা শশ্য শ্যামলা আদি সহভাগিতা থেকে বিদায় নিতে হল। ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমার এই প্রিয় প্রবাসভূমে অহরহ না হলেও মোটামুটি পরিলক্ষিত হয়। মর্ম কথায় বলতে হয়- ঘটনা সত্যি-আসামী নির্দোষ। দেখলেন তো- Kitchen Plate- (এক আনন্দ সহভাগিতা) থেকে কিভাবে Account Head বেড়ে গেলো? ভেদাভেদ - "আমাদের" নিজেদের মধ্যে। কোনো একটা বিষয় নিয়ে অনাবশ্যক চর্চা- প্রাসংগিক অপ্রাসংগিক বিষয়ের সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে আড্ডায় মেতে উঠে তর্কে গা ভাসিয়ে দিলে ভেদাভেদ দলাদলি অঙ্কুরিত হয়। এ সমস্যা আমাদের - "আমাদের" Liabilities বাড়িয়ে এমন একটা বিশেষ উপাদান তৈয়ারির - ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক সমস্যা। আমরা "আমাদের" সময়ে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য "আমাদের" আদি স্বপ্ন- সুদূর প্রসারী আর বহুমুখি পরিকল্পনা (Corn আর Soybeans খাদ্য) - যা আমাদের সেরা Source of শক্তি বাড়াবে) ছেড়ে অগ্রাধিকার পাওয়ার অযোগ্য Non Productive পরনিন্দা- পরচর্চা-রূপচর্চা (Ethanol) এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি এবং দেখি যে গবেষকরা বলেছেন Ethanol (সহজেই আগুন ধরিয়ে দেয়) কোন স্থায়ী সমাধান নয় এবং এর পার্শ প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি হারেই থেকে যাচ্ছে। আজ- এখন - June 7th এর সেই টাক ফাটানো আর বুক ফাটানো দুপুর। মনে পড়ে রক্ত গরম ১৯৭১? মাথা ঠান্ডা করে বাঙ্গালী স্বতবক নিয়োছিলো "একতা নাহলে মুক্তি নাই"। সর্বশেষ্ট বাঙ্গালীর হুশিয়ারী উচ্চারণ "বাঙ্গালীরা বুঝে শুনে কাজ করবেন "আমাদের" যেনো বদনাম না হয়"। আমাদের Population Growth তো হচ্ছেই- আরও হোক। "জয় যীশু" শোনাবে ভাল। It is not very critical not to have divided society like splints after a brush fire. It is also "now" that we are having the prime time- if we are late in forming a platfortm of protection then we ought to lose our precious achievements- so far. আজকাল প্রায়ই দেখা যায়- শোনা যায় ক্রেস্ট ভাগা-ভাগি- দেয়া নেয়া- হয়েছে। হচ্ছে। হবেও। হোক।

বিদায় না হোক। Oscar Night এ Winner of the Oscar এর নায়ক দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কাজে লেগে যায়- আর তাছাড়া ওই Oscar Trophy টাকেই তারা অভিজ্ঞতার এবং পারদর্শীতার মাপকাঠি হিসেবেই ব্যবহার করে। তাই এই দেয়া নেয়ার ভেতর দিয়েই প্রকাশ পাক-

আমরা এক বাগানের বাসিন্দা- (Garden of Eden)

এক বাগানে নাচি গাই- ফুলের একই মালায় জড়িয়ে- একই হয়ে রই।। একে অন্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা আর নির্ভরতা প্রতীকই হোক এই প্রতিকী দেয়া নেয়া- তবে একটা সঠিক বিষয়ের উপর- সঠিক স্বিদ্ধান্তে- সর্বসাধারণের স্বীকৃতিতে এবং সঙ্গে দু-একটা সাদা চুল না হলেও মেহিন্দী রঙের থাকলে মানায় ভাল। কারণ ওগুলোইতো ঈশ্বরদত্ত বাহাড়ী মাপকাঠি। হু- আবার মরনত্তরও এক কথা। কিন্তু আবার তখনতো ঐতিহাসিক ছবি থাকবেনা। সবই বুঝি। এ এক দারুণ বির্তক। "রক্ত মাংসে স্বর্গবাস" লেখাটা আগামি কোন সংস্করণের জন্য তোলা থাকলো। অগ্রিম-বন্ধক। হয়নি হয়নি Finishing টা দেয়া হয়নি. Speaking of Oscar Night আর এই প্রতীকী দেয়া নেয়া- এই Finishing টা কোনো বড় বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আরও Formal Way তে আরও Respected and Enjoyable Way তে In Presence of Friends and Relatives and Media এর সামনে করলে নিশ্চয় আরও শোভনীয় হবে। সমাজ সেবা যদি Noble Profession হয় তাহলে পারদর্শীদের জন্যে জায়গা দেয়া ভাল। সমাজ সেবা যদি Noble Hobby হয় তাহলে Subject Knowledge- বাড়তি সময় আর পকেটের গভীরতা ঠিক ঠাক মত মেপে ঝেপে যাচাই করে নেয়া আরোও ভালো। ঠাকুরের আমলে কে যেন বলেছিলেন "সমাজনীতি? ওতো জমিদারি "সখ" । এখন আমাদের যে সময় তাতে আমরা এক অসময়ের দিকেই দৌড়াচ্ছি। ওই অসময়কে মোকাবেলা করতে পারদর্শী-সচ্ছল-ভাবনাহীন-সেচ্ছাসেবক দরকার। প্রসংগক্রমে সবিনয়ের সাথে মনে করিয়ে দেবার জন্যে মনে পড়ে গেলো Tata Group এর Chairman (মালিক) JRD এর মূল্যবান বচন "Never start with diffidence. Always start with confidence. When you are successful - You must give back to society. Society gives us so much. We must reciprocate." সংসারের গতানুগতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে যারা সেই ৯০ এর গোড়ায় স্বপ্ন দেখেছিলেন আমাদের এই "আমাদের" নিয়ে। আর এই শুভ কাজের সূচনা করেছিলেন এবং তারপর বছরের পর বছর স্বপ্নকে লালন করে সংহত করেছেন এবং Now এ দু'টি Wings ই এখন Established Enterprise ওই ওদের প্রেরণাই হোক এদের পাশেও আর অতীতই হোক বর্তমানের পুঁজী। আমিও ওদের সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতার সু-উচ্চ স্থানে বসাতে চাই কারন ওদের শুরু করার জন্য- ওদের ভাবনার জন্য ওদের তদারকির জন্য আর ওদের যারা হাঁটি হাঁটি পায়ে County থেকে County তে এই নির্মল ফর্মূলা পৌছেছেন। এরা কেউই বসন্তের হেমন্ত ছিলেন না বরং কল্পনার জগৎ- সঙ্গবদ্ধ উৎসাহে সরল সাহসিক প্রচেষ্টায় আর প্রচুর সাধ্য সাধনায় পেরিয়ে আসার নেশায় মত্ত হয়েছিলেন। এখন শুভাকাথখিক সংখ্যা কোনো শুভং করের ফাঁকি নয়। অপ্রিয় তো অবশ্যই নয়- রীতিমত গর্ব করার মত সত্য- সূচনার শুন্যে এখন অসংখ্য শূন্য শাড়ী বেঁধে জমতে শুরু করেছে। এই শুন্যগুলো শুন্যে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই শূন্য স্বার্থ বিরোধী "চাহিদা" ই এখন একাগ্রতার অগ্রাধীকার হোক।

সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনেরও পরিবর্তন হয়। আর তা না হলে এখন এমন হয়? Global Warning এর যে ভীতি সামাজিক বিপ্লব হয়ে আমাদের দিনের পর দিন গ্রাস করছে- তার নতুন হুমকি এখন পুরা মানব জাতীকে আরও নতুন করে এবং সাবধানতায় পর্যালোচনা করতে হচ্ছে। কারণ এতদিনের জেনে আসা তিনভাগ জল আর এক ভাগ স্থল পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। না-না-ফারাক্কা না। Chinese Yellow River সহ আরও অনেক নদীর নাম আমরা জানি না যা শুকিয়ে যাচ্ছে। Punjab States শুকিয়ে যাচ্ছে। Mexico-Rio Grande- North Africa- Sudan- Red Sea বরাবর। Coastal Block of Atlantic Ocean সহ Australia শুকিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক নিয়মে? বলতে পারি না। সন্দেহ আছে। শুধু এটুকু বলতে পারি বারে বারে গাঁ ধোঁয়া আর বারে বারে গাড়ী ধোঁয়ার অশনি সংকেত আসছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে Fossil Energy অথবা Bio-fuel এর কথা বলা হচ্ছে তা তৈয়ারি করতে অসংখ্য হাজার হাজার লাখ লাখ Tons of Water- Corn and Soybeans দরকার হয়। ফলে সব ধরনের সংস্থা- সংগঠন - ভূমি-বধ্যভূমি- মরুভূমি এবং সাগর- মহাসাগর- নদী- খাল- বিল- পুকুর- নালা ব্যবহারের Orientationই Change করতে চাচ্ছে। সময়ের পরিবর্তন কেমন দেখুন। এক সময়ের মন ঠান্ডা করা আর রক্ত গরম করা Socialism এর প্রাণপুরুষ মহামতি Lenin এর প্রাণহীন Heartless Stoned Statue ইদানিং কালে নেমে এলো।

বিপরীত মুখী ধারা দেখুন। পক্ষান্তরে আমাদের সময়ের চাক্ষুস- Pride of Capitalism-Twin Tower ও নেমে এলো। কত সফল প্রাণের বৃথা আত্মোৎস্বর্গ। সময়ের দাবি। তাই বলছিলাম। আমাদের এই "আমাদের" এখন নতুন Orientation সময়ের দাবি। দেখুন- এই ক' দিন আগেই তো "আমাদের" এই "আমাদের" Brotherly Contribution এর ঠেলায় "আমাদের" Global Warming এমন পর্যায় চলে এসেছিলো যে আমার Brother দের কিছু সুস্থ সুচিন্তার বাস্তব প্রয়োগের জন্য এবারের মত মহাবিপর্য্যয় যাত্রা আপাতত ভঙ্গ হয়েছে। আজ CNN NBC ABC Fox এর মতই দুপুর থেকে "What is it that I want?" এর তর্জমায় গলা ভাংছে। (campaign suspend করার আগে উক্তিটি Hillary Clinton করেছিলেন) সত্যিই তো- আমি কি চাই? আমার প্রিয় নায়ক রাজ Razzak- স্বাধীনতার পরে পরে- মনে হয় তেহাত্তরের দিকে- সামাজিক বিপ□ব আর শ্রেণী সংগ্রাম উধ্বরিয়ে- Love and Passion ছবি গুলোতে কমা বসিয়ে- নতুন ধারার ছবি - Fighting Heat Beat "রংবাজ" এ অভিনয় করলেন। এক পর্যায় গান ধরলেন রাত দুপুরে। আর আমি আজ দিন দুপুরে বসে বসে যখন তত্ত্ব কথা রপ্ত করার চেষ্টা করছি তখন উদগিরন হল-এরকম। কি রে বাবা? পথ আগলে দাঁড়িয়েছো? কি বললে? FIGHT করবে? আমি LAMP POST বাবা! আমাকে মাফ করে দাও!! এই পথে পথে- আমি একা চলি- ভাবিনাতো মরি বাঁচি দেখেশুনে খেপে গেছি- যাই মুখে আসে তাই বলি!! এই পথে পথে- আমি একা চলি- মানুষের নামে যারা রাজপথে চলে- অমানুষ তাদেরই- সবাইতো বলে- আমি কিছু বলবনা- রাজপথে চলবনা- দিন রাত খুঁজি শুধু গলি- আর যাই মুখে আসে তাই বলি।। মাল নিয়ে গোলমাল চিরকাল চলে কেউ গোনে টাকা পাই কেউ করে দিন কামাই আমি ভাই বেশ আছি রাজপথে একা একা চলি আর যাই মুখে আসে চাই বলি।। আজকাল আমিও আবার মাঝে মাঝে কল্পনায় ভাবি আমার Funeral যদি মানুষহীন হয়- কাক পঙ্খী যদি শুধু আসে- যেমন মুনিয়া- ময়না-শালিক- চুরুই- বাবুই- বুলবুলী- মাছরাঙ্গা- বক- টিয়া আর ওদের পেছনে পেছনে যদি দু'একটা চিল আর শকুনও যদি আসে তবে বুজবো- আমার মরনত্তোর সেবাও তো হলো। Father of the Nation- Washington এর কাঁদায় আটকে যাওয়া গাড়ি ঠেলে ওঠানো। বুড়ো চাচার ছেলেদের লাঠির বোঝা ভাংতে না পারার কাহিনী তো আর আমাদের মন থেকে মুছে যায়নি। নতুন নয়। নতুন হলো জগত জুড়ে এখন চলছে Priority বেছে নেয়ার তর্ক-বির্তক। ভূঁইফোড় যত্রতত্র সংগঠন গোড়ে ওঠানো কোনো বিকল্প নয় বরং দাঁড়ানোর এখনি সময়। ছত্রভঙ্গ লোকবলের মাধ্যমে দায়িত্ব পাওয়া যায়- কিন্তু সম্পাদন করার Satisfaction পাওয়া যায় না। লোকবল- মনোবলহীন হলে Non Productive হয়ে Liabities বাড়িয়ে দেয়। মনোবলের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে পুঁজি- বিনিযোগ তৈয়ারির ক্রিয়া প্রক্রিয়ার স্পাইশি মাল মশলা। আবার মনোবলই তৈয়ারি করে অর্থবল তাই এই তিনের সমন্বয়ে হোক একগ্রতার অগ্রাধিকার। Ton Priority of Determind Determination. পিছিয়ে পড়াটা আর দু' এক মৌসুমে "আমাদের" ধাচে সয়ে যাবে সুতরাং Agenda ছোটো রেখে complete করা এখনো সম্ভব নতুবা চক্র বৃদ্ধি হারে Very High Rate এ শোধ গুণেও ধকল সোয়া মুশকিল হবে। উপসংহারে আমাদের Tri-State এরিয়ার স্বনামধন্য Forman Mayor of New York Ed Eoch এর বিখ্যাত বুলি দিয়ে শেষ করতে চাই "Normally there is a love- hate relationship. (in Society)- but I think love is in the ascendancy now as far as the New York (Tri-State) concern. We (Probashi-Solution) did very well".

St. Gregory's High School- a reflection

Dr. Chowdhury Ishraq Uz Zaman

IT was during one of my recent trips to Bangladesh that I visited Saint Gregory's High School. It has been 35 years now that I had walked out through the gates of my school for the last time. Only once- since then- do I remember having returned to the warm embrace of my alma mater for the 100th anniversary celebrations. I therefore- and quite rightly- considered myself as guilty as anyone who ignores his very roots and quite wantonly forgets where he rose from. This trip to Saint Gregory's was thus an attempt at redeeming me of that guilt. Equally important perhaps- was an innate desire to relive those moments of childhood lost to the fathomless well of Time.
Shabbir Ahmed Imtiaz- my childhood friend from our days at St Gregory's was quick to offer to accompany me- and to arrange for the transport. Here- perhaps- was another Gregorian suffering from guilt similar to mine and looking for atonement himself.

With the car snaking its way through the snarl of Old Dhaka traffic at the pace of a snail- I had all the time in the world to soak in the familiar sights of yesteryear. In the blink of an eye I am transported into a packed rickety "Town 2A Service" bus incessantly blowing its familiar foghorn as it makes its way to Victoria Park (later renamed Bahadur Shah Park).

I am suddenly shaken out of my blissful reminiscence as Shabbir asks- "Remember Victoria Park?"...How could I forget Victoria Park? How could I ever forget getting off the bus at Victoria Park every morning on way to school and the instinctive glance at the clock of the Armenian Church... will I be able to squeeze in a quick game of basketball or handball before assembly?

Luxmi Bazaar Road in front of the school is not quite the same anymore. More people and more rickshaws make everything look so much more crowded - so different. Gone also is the very familiar and traditional-looking Municipal Corporation building right across from the school a landmark we had come to accept as universal.

My eyes are instinctively drawn to a corner right outside the school gates...my heart seems to know what I am looking for...but I don't see the old bearded jhaalmuri-wala standing there- selling his mouth-watering spicy puffed rice. Thirty five years later- he is not expected to be there. But I do believe that if I could turn the clock back that many years- he would immediately reappear at that corner and sell me his jhaalmuri with a lot of kashondi (mustard) (the way I always liked it). I feel a strange heaviness in my chest.

The familiar drone of countless chatter greets us as we enter the school yard. "Look- Shabbir! The cycle stands are still here!" We walk up to the church which is now barricaded by a steel fence. One thing is certain no one can sit on the steps anymore under the bell tower and share stories during lunch break- like we often did.

Shabbir and I enter the large central hall of the Main Building the very heart of St. Gregory's a place we would visit at least once everyday (even if our class was in another building) because it had- among other things- the library and the notice boards.

It was the notice boards- in particular- that we were always attracted to because they announced everything- from those as heartening as "Rainy day No school" to attractive gifts (that were up for grabs) pinned onto the notice board by Brother Hobart.

I am forced by the child in me to scamper up to one of the notice boards for a closer look it is not a rainy day today- Brother Hobart's gifts are not there anymore. Standing there- 35-40 years later- I can almost smell the sweet pungent aroma of a cigar- and almost feel a familiar punch on my arm as a resounding voice booms above me- "Ki Koros?" ("What are you doing?"). I turn my head and look up Brother Hobart Pieper is not there.

The deafening silence of the main hall nearly knocks me over; the sound of multitude familiar footsteps made all the more prominent by their very absence. I turn to look around the haunting emptiness of a place once bustling with life hits home... as I realize that this place is now abandoned.

I am informed that since a new massive building was being constructed- everything was in the process of being moved out of the older edifice to prepare to tear it down. It was not

only saddening but also distressing to realize that this majestic structure that had nurtured countless young buds of talent for more than a century- helping them to bloom into the movers and shakers of this country- was to be disemboweled and then destroyed.

And so I take my time looking around; taking in all those familiar features we hold so dear...the arched doors- the stained-glass windows- the statue of Saint Gregory- the steel beams holding up the ceiling- the crack in the paint and every intimate curve- corner- nook- niche and cranny of St Gregory's High School...that I will perhaps never see again.

My attention is instinctively drawn to the door of the Teachers' Room across the hall. I can almost see our teachers...Mr. Peter D'Costa (wearing the familiar salmon-colored shirt- always a size larger)- Mr. N. K. Sarker (in his immaculate white 'dhoti')- Mr. Nicholas Rozario (looking as sharp as a scout master should)- Mr. N. C. Sutradhar and a few others walking out... books and attendance register in hand- as they make their way to our classrooms where we are raising hell between periods.

Shabbir and I then wander into the smaller hall further down from the main hall where the library used to be. The massive shelves and the hundreds of books have all been removed. The room looks as bare as a flower robbed of its color and fragrance. Quite surprisingly- though- the small desk at the corner meant for issuing books is still there. I touch it lightly as I try to travel back in time...imagining that I am waiting there as the librarian puts the 'return-date stamp' on books about airplanes- ships- trains or planets that I am taking home to read.

Opening into the library area (right at the bottom of the stairs) is Class 9 with its saloon-style swinging doors. I was in this very class exactly thirty seven years ago. The desks and the benches are all gone. I walk into an eerie silence and a ghostly emptiness.

The familiar gray cement floor- the arched doors and the blackboard (taking up most of one wall) stirs up recollections of a time long gone. I walk over to stand at the exact spot where Sadeq once pulled out the bench from under Azizur Rahman (almost twice his size) as we were all sitting down after greeting our teacher and Azizur Rahman promptly disappeared with a resounding thud. (Sadeq of course- was thereafter made to stand on a bench for most of the period by the teacher- for having pulled off a fast one in his presence).

Synapses of old memories begin to crackle to life... and from somewhere deep within- an ear-shattering chant wells up in my head:

"Are you sleeping- are you sleeping-

Bro-ther Charles- Bro-ther Charles?

Morning bells are ringing-

Morning bells are ringing-

Ding-Ding-Dong

Ding-Ding-Dong"

Obviously we are waiting for Brother Charles to come in to teach us physics or chemistry and (in our opinion) making best use of the couple of minutes that we have to ourselves. Standing there in the middle of the classroom- I can almost single out every adolescent voice of every class-friend of ours (now scattered all over the world) who joins in the chant. I instinctively glance at the swinging door...for any moment now I expect the otherwise mild mannered and soft spoken Brother Charles to barge in- livid with anger- and knock one of the swinging doors off its hinges with his fist (like he once did)... Brother Charles Bibeau never arrives.

We walk out of the Main Building through a door leading out to the side...and right there stands the water fountain. For some strange reason (and to this day I have not been able to explain why) we always seemed to drift toward the water fountain and hover around it. One of the most obvious reasons- I believe- was that there was water there and we always seemed to be thirsty notably during a class.

A few paces away to one side of the fountain stands a memorial dedicated to Mr. Peter D'Costa- Mr. N. C. Sutradhar and Mr. D. N. Pal Choudhury three of our teachers who left before their time. I stand in front of the monument with reverence as I read the names of my teachers from four decades ago. Somewhere deep within- I get the feeling of three pairs of eyes looking down on me with kindness and warmth - and then touching my heart with a fondness and affection that is as overpowering as it is overwhelming.

As I stand there under the blazing sun- a floodgate seems to open with a deluge of names from the past Brother Robert Hughes CSC- Brother Hobart Pieper CSC- Mr. N. K. Sarker- Mr. S. R. Chaudhury- Brother Charles Bibeau CSC- Mr. Kamil Ali- Mr. Nicholas Rozario and others we will never see again- however much we may wish to.

If there was any way that I could get my voice to travel across the intangible web of Time- or the ethereal boundary that separates the living from the dead- I would assure them that countless glorious monuments have been dedicated to each and every one of them....in every country and in every corner of this world that every Gregorian standing today is a living monument immortalizing their unwavering sincerity- dedication and perseverance and will continue to be so for generations to come.

(Dr. Chowdhury Ishraq Uz Zaman writes from Ottawa-Canada)

রোম ভেনিসের গল্প

জিতা গমেজ

২০০৬ এর মে মাসে গিয়েছিলাম পূন্যভূমি ভ্যাটিকান সিটিতে। সেই সাথে সুযোগ হয়েছিল রোম নগরী - ভেনিস দেখার। আমার বাবা খৃস্টফার রোজারিও এবং মা লীনা রোজারিও অনেকদিন ধরেই ভাবছিলেন ইটালীতে যাবেন। হঠাৎ করেই আমি এবং আমার বোন কেয়া সিদ্ধান্ত নিলাম আমরাও যাবো সাথে। আমার স্বামী কিশোর- এক বোনের স্বামী বে□ইজ সংসার এবং সন্তানদের দেখাশুনা করে সহযোগীতা করলেন যেন আমরা নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে ঘুরে আসতে পারি। তাদের আন্তরিক অনুপ্রেরণা না পেলে আমাদের যাত্রা এতোখানি আন্দময় হতো না। যাবার আগে প্রায় দেড়-দুই মাস ভ্যাটিকান- রোম এবং ভেনিসের সম্পর্কে কিছু বই পড়ে নিলাম যাতে অল্প সময়ে অনেক কিছু দেখতে পারি। আমার সোশ্যাল সিকিউরিটি (Social Security) অফিসের এক সহকর্মী প্রচুর বই- ছবি এনে দিলেন- সুবিধা অসুবিধার গল্প করলেন। আমাকে এতখানি প্রস্তুত করে দেবার জন্য আমি সত্যিই তার কাছে ঋণী। কিছুদিন আগে তিনি গত হয়েছেন। এই লেখার পাঠকেরা হয়তো অনেকেই তীর্থে বা কাজে রোমে যাবেন। তাদের যদি এই প্রবন্ধটি পড়ে কিছু প্রাচীন নিদর্শন দেখার সুবিধা হয় তাহলেই লেখাটি স্বার্থকতা পাবে। ভ্যাটিকান সিটিতে প্রবেশ করে এক শান্তিময়ভাব আছন্ন করে সবাইকে। চারিদিকে খৃষ্টভক্তরা দলে দলে প্রার্থনার মাধ্যমে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে St. Peter's Basilica র দিকে। তীর্থযাত্রীদের মতই পর্যটকরা ধর্মীয় গাম্ভির্য্য রক্ষা করে চলে। সেন্ট পিটার গির্জা আজ যেখানে দাঁড়িয়ে সেইখানেই প্রায় ২০০০ বছর আগে সাধু পিতরকে হত্যা করা হয়েছিল। তার দেহাবশেষ সমাধিস্থ আছে ব্যাসিলিকার নিচে। ভ্যাটিকানের আছে নিজস্ব সৈন্য। তাদের পোশাকের নমুনা একেঁছেন মাইকেল এ্যাঞ্জেলো নিজেই। তাঁর- এবং আরো অনেক বিখ্যাত শিল্পীর অবিশ্বরণীয় শিল্পকর্ম প্রাচুর্য্যময় করেছে ব্যাসিলিকা এবং চত্বরটিকে। কুমারী মারিয়ার কোলে যীশু- মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর বিখ্যাত "পিয়েটা" মূর্তিটি এতোই নিখুঁত যে চোখ ফেরানো যায় না। ব্যাসিলিকা থেকে বেরিয়ে চলে গেলাম "সিসটিন চ্যাপেল এ (Sisting Chapel) যার সম্পূর্ন দেয়াল ও ছাদ ভরা চমৎকার সব রঙ্গীন চিত্রকর্ম। দিনের পর দিন কাঠের পাটাতনে চিত হয়ে শুয়ে খেয়ে না খেয়ে কখনো অসুস্থ হয়ে (Michael Angelo) আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে যে অনবদ্য শিল্প কর্ম আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন তা আরো বহু যুগ ধরে মানুষকে স্তম্ভিত করবে। দালানের বাইরে দেখেছি সেই বিখ্যাত চিমনি যার সাদা বা কালো ধোঁয়া দিয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয় নতুন পোপ মনোনয়নের। ভ্যাটিকান মিউজিয়াম এতো সুন্দর সব প্রাচীন সামগ্রীতে ভরা যে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে কয়েক বছর লেগে যাবে। উলে□খযোগ্য লেগেছে খৃষ্টের জন্মের একশ বছর আগের তৈরি মূর্তি Lacoon- রাজা নিরোর বিশাল মার্বেল পাথরের স্নানের টাব (Bathtub) এবং মোজাইক করা মেঝে। কারকেলার বিশাল স্নানের প্রাসাদে আরো এমন নিদর্শন পাওয়া যায়- হাজার হাজার বছর আগে কোন আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া কি করে মানুষ এতো নিখুঁত কারুকার্য্যময় মোজাইক অথবা দালান কোঠা তৈরি করতে পেরেছে ভেবে বিস্মিত হই। ভ্যাটিকান লাইব্রেরীতে রয়েছে প্রচুর দূলর্ভ প্রাচীন সব বই। Gallary of MAP এ আজ থেকে পাচঁশ বছর আগের হাতে আঁকা পৃথিবীর যে মানচিত্র গুলো শোভা পাচ্ছে তা আধুনিক যুগের পরীক্ষার মাধ্যমেও নির্ভুল প্রমানিত হয়েছে। St. Peter's এর উল্টো দিকেই রয়েছে বিরাট এক প্রাসাদ। রাজা হেডরিয়ান যীশুর জন্মের ১২৩ বছর পরে এই স্থাপত্যের কাজ শুরু করেন তার নিজের মরদেহ ধারণের জন্য। রোম শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেখা যায় এই প্রাসাদটি। পরবর্তীতে এটিকে নামকরণ করা হয় Castle St. Angelo দু'দিকে সারি সারি দূতের মূর্তি সজ্জিত একটি সেতু আছে প্রাসাদটির সামনে। জানিনা অপ্রাসঙ্গিক হবে কিনা- তবুও লিখছি রোমে দেখা কিছু বাংলাদেশী ভাইদের কথা। পরিচয় পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন "আপনারা কি জানেন আপনারা কত ভাগ্যবান যে পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরে বাস করছেন? হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের মাঝে আপনাদের বসবাস।" উত্তরে জানালেন তারা "বিশ্বাস করুণ জীবিকার তাগিদে এতোই ব্যাস্ত থাকতে হয় যে একদন্ড সৌন্দর্য্য উপভোগের সুযোগও মেলে না।" মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাস্তবেই দেখলাম কখনো তারা নাভোর্নার চত্বরে কখনো কলেসিয়োমের অথবা প্যান্থিয়নের সামনে খেলনা অথবা ব্যাগ বিক্রি করছেন। পুলিশের বাঁশি শুনলেই সব জিনিষ গুছিয়ে ছুটে যাচ্ছেন অন্য গন্তব্যে। অগনিত গীর্জায় শোভিত রোম নগরী। তার মধ্যে ল্যাটেরেনো (Laterano) ম্যাগলিস্তরী (Maggliore) সাধ্বী আগনেস এর গির্জা বিশেষ ভাবে পরিচিত। ল্যাটেরোনের মাঝেই রয়েছে সেই পুন্য সিঁড়ি যা দিয়ে আমাদের ত্রানকর্তা যীশুখৃষ্টকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পিলাতের সামনের বিচারের উদ্দেশ্যে। এতো গির্জার মাঝেও আমার মন কেড়েছে সাধু পৌলের গীর্জা। অনড়ম্বর সবুজ চত্বরে ঘেরা এই গীর্জাটি মনের মাঝে যে প্রশান্তির ছায়া ফেলেছিল তুলনাহীন। রোম নগরীকে সজ্জিত করে রেখেছে অপূর্ব সব মূর্তিময় ফোয়ারা আর চত্বর। কোলোনা- ডিকাপ্মপো ফিউরি- ভেনেজিয়া এমনি কিছু চত্বর। সবচেয়ে সুন্দর নাভোরনা। যার ঠিক মাঝখানটিতে রয়েছে শিল্পী বারনিনির "নদী" নামে মূর্তিময় ফোয়ারা- আমি আশ্চর্য হয়েছি জেনে তার একটি নদী গঙ্গা। শিল্পী সেলভি তৈরী মধ্যযুগীয় ট্রেভি ফোয়ার (Trevi) কথা ভুলতে পারিনা। বহু ছায়াছবিতে এই ফোয়ারাটি ব্যবহার করা হয়েছে। কথিত আছে পেছনে ফিরে ফোয়ারটিতে পয়সা ফেললে রোমে আবার ফিরে যাওয়া নিশ্চিত হবে। আধুনিক দালান কোঠার মাঝে কারুকার্যময় অপূর্ব ঐতিহাসিক ফোয়ারার সহঅবস্থান বুঝি শুধু রোম নগীরতেই সম্ভব। রোমের ঐতিহ্য তার প্রাচীনতম অংশ রোমান ফোরাম (Roman Forum) অবিশ্বাস্য লাগে যে ৩ হাজার বছরের পুরোনো শহর আজও পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে মানুষকে হারানো দিনের সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করায়। ক্যালটানটিনের তোড়নের পাথুরে গায়ে হাত রেখে সর্বশরীরে শিহরণ বয়ে গেলো। হঠাৎ মনে হলো আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে এমনি করেই হয়তো কারো হাত এই পাথরটি ছুঁয়েছিল। এই পথেই একদিন হেঁটে গেছে রোমানবাসী উপাসনায় বাজারে বা কাজে। গণতন্ত্রের মূলমন্ত্রকে লালন করা হতো এই সেনেটেই। আর এইখানেই একদিন ব্রুটাসের হাতে নিহত হয়েছিল বিখ্যাত শাসক জুলিয়াস সিজার। তার কবরটি এখনও রয়েছে ফোরামে। বেনহুর ছায়াছবিটি অনেকেই হয়তো দেখেছেন। সেই গল্পটিতে একটি ঘোড় দৌঁড়ের মাঠ দেখানো হয়। কোরামের কাছেই রয়েছে প্রাচীন সেই সার্কাস ম্যাক্সীমাস (Maximus) মাঠটি। ঐতিহাসিক শহরের রয়েছে পাথরের বৃহৎ চাকতি যার পুরোটা জুড়েই রয়েছে একটি মুখ। কথিত আছে- সেইকালে বিশ্বাস করা হত মুখটিতে হাত ঢুকিয়ে মানুষের সত্যবাদীতা যাচাই করা যায়। মিথ্যেবাদীদের হাতটি কেটে ভেতরে রয়ে যেত। ভেনিস (Venice)ঃ রোম থেকে খুব সহজেই একটি ট্রেন নিয়ে চলে যাওয়া যায় ভেনিসে। ইচ্ছে করলে একই দিনে ফিরেও আসা সম্ভব। পৃথিবীর বুকে যে এতো চমকপদ ভিন্ন ধরনের একটি শহর থাকতে পারে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয়না। এই একটি মাত্র স্থান পৃথিবীতে যেখানে রাস্তা দিয়ে কোন যানবাহন চলে না। সেখানে গাড়ী- ঘোড়া- ট্রেন- বাস নেই- এমনকি একটা সাইকেলও নেই। সব যাতায়াতই করা হয় ছোট ছোট খাল দিয়ে নৌকোয় চড়ে। "গন্ডোলা" নামে এই জলযান গুলোর মাঝিরা সবাই একই ধরনের কাপড় আর টুপি পরে। খালের উপর দিয়ে আছে অজস্র ছোট ছোট সেতু। ইতালীর ভেনিস শহরটির গোড়াপত্তন হয় যীশুর জন্মের ৫০০ বছর পরে। সেই থেকে বিভিন্ন দেশের সভ্যতা এর উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং তাদের নিজস্ব কৃষ্টির সম্ভারে ভূষিত করে। ভেনিসের সবচেয়ে বিখ্যাত স্থানটি হলো সেন্ট মার্কের চত্বর (St. Marks) বিশাল এলাকা জুড়ে চত্বরটির মাঝখানে রয়েছে সেন্ট মার্কের গির্জা। কথিত আছে- মিশর থেকে সাধু মার্কের দেহাবশেষ সংগ্রহ করে এই স্থানে পুনরায় সমাধিস্থ করা হয়েছিল। ইউরোপের আর সব গির্জার চেয়ে সোনালী মোজাইক সজ্জিত এই গির্জাটি একেবারেই অন্যরকম। ভেনিস যখন মধ্যযুগে ঐশ্বর্য্যে- প্রতিপত্তিতে শীর্ষস্থানীয় তখন বিভিন্ন দেশের সাথে বানিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। হাজার হাজার বানিজ্য জাহাজ নোঁঙ্গর ফেলতো ভেনিসে। প্রতিটি জাহাজেই কিছু না কিছু উপহার আনা ছিল বাধ্যতামূলক। সেই কারণে সেন্ট মার্কে বিভিন্ন সভ্যতার আর সাংস্কৃতিক নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে উলে□খযোগ্য বাইজেনটাইন ও ইসলামীক সভ্যতা। ডোজের (Doge) গোলাপী প্রাসাদ- বিশাল ঘড়ির প্রাসাদ সবই মন কেড়ে নেয়। সেন্ট মার্কের চত্বরের উল্টো দিকে রয়েছে ১৭০০ সালের তৈরী সান্তামারীয়া দেলা সালুতে নামে একটি সুন্দর গির্জা। ভয়ঙ্কর পে□গে যখন লাখ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছিল মধ্যযুগে- তখন ভেনিসবাসী প্রতিজ্ঞা করে এই মহামারী থেকে মুক্তি পেলে তারা একটি গির্জা তৈরী করবে ধন্যবাদ দিতে। এই সেই গির্জা। একটি সেতু না দেখলে ভেনিস দেখা অপূর্ণ থেকে যায়। তা হলে "দীর্ঘশ্বাসের সেতু (Bridge of Sighs) ডোজের- অর্থাৎ তৎকালীন শাসকদের প্রাসাদে বিচারের পর কয়েদীদের একটি ছাদে ঢাকা বন্ধ সেতু দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো কারাগারে। সেখানে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হতো অথবা আটকে রাখা হতো যাবত্জীবন। সেতুর ঝাজরীকাটা খুলখুলি দিয়ে কয়েদীরা শেষ বারের মত দেখতে পেত বাইরের পৃথিবী। ভেনিসের সৌন্দর্য্যের শেষ দৃশ্যটি একটি দীর্ঘশ্বাস হয়ে রয়ে যেত তাদের অন্তরে। সেই কারণেই নাম দীর্ঘশ্বাসের সেতু। রাতে ভেনিস সাজে আর এক মনমোহিনী সাজে। চারিদিকে প্রদীপের মত বাতি ঝিলমিল করে প্রতিবিম্ব ফেলে নদীর বুকে। মিষ্টি মধুর বাজনায় মুখরিত হয়ে থাকে সমস্ত প্রাঙ্গন আর ঘাট। দেখতে দেখতে আমাদের ইতালীর ছোট সফর শেষ হয়ে এলো- আমরা ফিরে এলাম আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আপন আপন জগতে। শুধু স্মৃতির পাতায় রোম আর ভেনিস অমর হয়ে থেকে গেল। ব্যক্তিগতভাবে স্মৃতি জিনিসটা আমার কাছে খুব মূল্যবান। সবার কাছেই হয়তো। কারণ এটিই তো একমাত্র সম্পদ যা আজীবন থেকে যায়। আমার বাবা বলেন ভোগ একা করা যায় কিন্তু উপভোগ করতে হয় অনেকের সাথে। সেই কারণে বোধহয় এই লেখা। এটি পড়ে যদি রোম ভেনিসকে আমার মত করে কেউ পছন্দ করে উপভোগ করেন- তবেই লেখাটি সার্থকতা পাবে।

ভাওয়াল সমাচার

যেরোম ডি'কস্তা- টরেন্টো- কানাডা

ভাওয়াল- ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক- ভাওয়াল রাজবাড়ী- ভাওয়াল এস্টেট- ভাওয়াল জমিদারী- ভাওয়াল রাজ্য- ভাওয়াল পরগনা- এ নাম গুলোর কোন না কোনটি সম্পর্কে নিশ্চয়ই শুনেছেন। এ ভাওয়াল এলাকাটি ঢাকা নগরীরর উত্তরে অবস্থিত। জয়দেবপুর ছিল ভাওয়াল জমিদারী বা ভাওয়াল রাজ্যের কেন্দ্রস্থল। ভাওয়াল জমিদার (রাজা) এখানেই বাস করতেন। পটভূমি সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে গাজী পরিবারের দৌলত গাজী ভাওয়াল পরগনার জমিদার ছিলেন। এ জমিদারের দেওয়ান বা প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ছিলেন মুন্সিগঞ্জের বজ্রযোগিনীর অধিবাসী বালা রাম নামক হিন্দু ভদ্রলোক। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে মোঘল শাসিত বঙ্গ প্রদেশের দেওয়ান ছিলেন মুর্শীদ কুলী খান। রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার্থে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান জমিদারকে পদচ্যুত করে হিন্দু জমিদারদের সেখানে বসান। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রথমে বালা রাম এবং পরে তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ মুর্শীদ কুলী খানের সন্তুষ্টি বিধান করে ভাওয়ালের জমিদারিত্ব লাভ করেন। পরবর্তীকালে পূর্ব্বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ছোট ছোট জমিদারী ক্রয়ের ফলে ভাওয়াল জমিদারী দ্বিতীয় বৃহত্তর জমিদারীতে পরিণত হয়। তখন ঢাকার নবাবের জমিদারী ছিল সর্ববৃহৎ। তৎকালীন ময়মনসিংহ- ঢাকা- ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলাস্থ কয়েকটি জমিদারী ভাওয়াল জমিদারী অন্তর্ভূক্ত হয়। ঢাকা শহর ও তার আশেপাশের বেশ কিছু এলাকাও এ জমিদারীর আওতাভুক্ত ছিল। ১৮৭৮ খ্রীঃ থেকে বৃটিশদের কাছ থেকে জমিদার কালীনারায়ন রায় চৌধুরী সম্মানসূচক 'রাজা' উপাধি লাভ করেন- যা বংশানুক্রমিকভাবে চলতে থাকে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়- ভাওয়াল জমিদারের অধীনে ২-২৭৪টি মৌজায় ৪৫৯-১৬৩ একর জমি ছিল। ১৯০৪ খ্রীঃ এ জমিদারী থেকে রাজস্ব বাবদ ৮৩-০৫২ টাকা বৃটিশ সরকারকে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে- অধিকাংশ জমিদার 'অনুপস্থিত জমিদার' ছিলেন। এরা নিজেদের গ্রামীন জমিদারীতে বাস না করে বাস করতেন ঢাকা ও কোলকাতার মত বড় বড় শহরে এবং নানা ধরনের ইন্দ্রিয়াশক্তি ও ভোগবিলাসে মত্ত থাকতেন। ভাওয়ালের জমিদারগণ প্রধানতঃ জয়দেবপুরেই থাকতেন এবং নিজেরাই জমিদারী শাসন করতেন। ভাওয়ালের সর্বশেষ মহান জমিদার ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রনারায়ন রায় চৌধুরী। ১৯০১ খ্রীঃ তিনি তিন নাবালক পুত্রকে (রনেন্দ্রনারায়ন- রামেন্দ্রনারায়ন ও রবীন্দ্রনারায়ন) রেখে মারা যান। তখন প্রতিপাল্যধিকরণ (কোর্ট অব ওয়ার্ডস) এ পুত্রদের পক্ষে জমিদারী পরিচালনা করতে থাকে। জমিদার পুত্ররা শিক্ষাদীক্ষায় অমনোযোগী ছিলেন এবং তারাও ইন্দ্রিয়পরায়ন হয়ে বড় হয়েছিল। ১৯০৯ খ্রিঃ দ্বিতীয় পুত্র রামেন্দ্রনারায়ন অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসা ও বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে দার্জিলিং যান। কথা রটে যে- তাঁর স্ত্রী বিভাবতী দেবী অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রণয়াসক্ত ছিলেন বলে এক চিকিৎসকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বিষ প্রয়োগে স্বামীকে হত্যা করেন। তাঁর মরদেহ দাহ করার জন্য শশ্মানে নিয়ে যাওয়া হয়। হঠাৎ প্রবল শিলাবৃষ্টির কারনে সবাই ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যান। বৃষ্টির পর কয়েকজন হিন্দু নাগা সন্ন্যাসী পাশ দিয়ে যাবার সময় অজ্ঞান ব্যক্তিকে দেখে তাদের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলেন। জমিদার মশাই তখন ১৯০৯ থেকে ১৯২০ খ্রীঃ পর্যন্ত ভ্রমনশীল সন্ন্যাসীদের সঙ্গেই জীবন কাটান। ইতিমধ্যে অন্য দু'ভাইয়ের মৃত্যু হয়। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা ফেরার পথে অকস্মাৎ নাকি তাঁর স্মৃতিশক্তি ফিরে আসে। তখন তিনি জয়দেবপুরে না ফেরার মনস্থ করেন এবং ঢাকার সদরঘাটের বাকল্যান্ড বাঁধের এক পাশে তার আস্তানা গড়েন। বেশ কিছু লোক তাঁকে দেখে তাদের জমিদার হিসেবে চিনতে পারেন। অবশেষে নানা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর জমিদারী ফিরে পাবার মানসে ১৯৩৩ খ্রীঃ একটি মামলা শুরু করেন। ১৯৩৭ খ্রীঃ জজ তাঁর রায়ে এ সন্ন্যাসীকেই রামেন্দ্রনারায়ন রায় চৌধুরী বলে রায় দেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী এ রায় মেনে নেননি এবং তাঁকে স্বামী বলেও স্বীকৃতি দেননি। তার আপীলের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টও নিম্নকোর্টের রায়ই বলবৎ রাখেন। বিভাবতী দেবী সর্বশেষ চেষ্টা হিসেবে ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে (মন্ত্রীসভায়) আপীল করতে চাইলে হাইকোর্ট সে অনুমতি দেয়নি। ১৯৪৭ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর বৃটিশ শাসনের সমাপ্তি ঘটে। ১৯৫০ খ্রীঃ পাকিস্তান সরকার পাকিস্তান ব্যাপী জমিদার প্রথা রদ করে দিলে অন্যান্য জমিদারীর ন্যায় ভাওয়াল জমিদারী ও সরকারীকরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে- ভাওয়াল জমিদারের (রাজার) এ কাহিনী নিয়ে এ পর্যন্ত ভারত- পাকিস্তান ও বাংলাদেশে অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা- গান- গীতিকবিতা- নাটক- সিনেমা ও যাত্রা তৈরী হয়েছে। ভাওয়াল অঞ্চলে কাথলিক বসতি তুমিলিয়া (স্থাপিত ১৮৪৪ খ্রীঃ)- রাঙ্গামাটিয়া (১৯২৪ খ্রীঃ)- নাগরী (১৬৯৫ খ্রীঃ)- মঠবাড়ী (১৯২৫খ্রীঃ)- মাউসাইদ (১৮৯৩ খ্রীঃ) এবং ধরেন্ডা (১০২৬ খ্রীঃ) গির্জাগুলো ভাওয়াল এলাকাধীন বলে ধরা হয়। প্রধানতঃ ভাওয়াল জমিদারদের কাছ থেকে জমি পত্তন নিয়ে অধিকাংশ কাথলিক এসব এলাকার বসতি শুরু করেন। বর্তমানে এসব গির্জার অধীনে ৩০ হাজারের অধিক কাথলিকের বাস। ১৯৭১ খ্রীঃ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কাথলিকদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষিজীবী। তাদের নিজস্ব এলাকাতেই তারা তাদের জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করতেন। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার ভূষর্না রাজ্যের জমিদার পুত্র কাথলিক ধর্ম গ্রহণ করে আন্তইন দা রোজারিও নাম গ্রহণ করেন। পরে তিনি নিজ এলাকায় পৌঁছে তার স্ত্রী এবং কিছু আত্মীয়স্বজন ও অন্য লোককে ধর্মান্তরিত করেন। পরবর্তীতে এ ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা নানাভাবে নি-গৃহীত হচ্ছিলেন। পুর্তগীজ আগস্টিলিয়ান ফাদার লুই দস্ আঞ্জস্ নাগরী গ্রামটি ক্রয় করে এদেরকে সেখানে বসতি করান। আন্তইন দা রোজারিও পরবর্তীকালে ঢাকার উত্তরে নদীতীরে বসবাসরত প্রায় ৩০-০০০ লোককে ধর্মান্তরিত করেন ঠিক কোন স্থানে এটি ঘটে তা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। নাগরী এলাকার কাথলিক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের কেউ কেউ হয়তো মঠবাড়ী এলাকায় গিয়ে বসতি করেন। পরে তুমিলিয়া ও রাঙ্গামাটি অঞ্চলে কাথলিকের বসবাস শুরু হয়। সম্ভবতঃ লরিকূল ও শোলপুর থেকে কাথলিক এ অঞ্চলে আগমন করেন। মাউসাইদ অঞ্চলে প্রথমে কোথা থেকে কাথলিক গেছেন- তা এখনও জানা যায়নি। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে টঙ্গী থেকে ভৈরব পর্যন্ত রেললাইন বিস্তৃত করার মানসে বৃটিশ সরকার দড়িপাড়া ও তুমিলিয়া অঞ্চলের কিছু জমি হুকুম-দখল করলে বেশ কিছু পরিবার সাভার অঞ্চলের কমলাপুর ও ধরেন্ডায় গিয়ে বসতি করেন।

ভাওয়াল বনাম আঠারোগ্রামঃ

ভাওয়াল অঞ্চলের কাথলিকদের মধ্যে যেসব পুর্তগীজ পদবী বা পারিবারিক নাম ব্যবহৃত হয়ে আসছে তাতে অনেক বৈচিত্র লক্ষ্যনীয়।

কস্তা- কুইয়া- ক্রুজ- কুলুম্ভনু- কোড়াইয়া- গানসালভেস্- গমেজ- তস্কানু- দরেস- দা কস্তা- দা রোজারিও- দা সিলভা- দিয়াস- পালমা- পুরিফিকাসাও (পিউরিফিকেশন)- রদ্রিকস্- রিবেরো- রেগো- রোজারিও এবং সেরাও। অন্যদিকে- আঠারো গ্রামবাসীদের পদবী গুলোতে তেমন বৈচিত্র নেই। তাদের মধ্যে গমেজ এর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী- তারপর হচ্ছে রোজারিও এবং দারোজারিও। বিবেরু ও কস্তা-র সংখ্যা খুবই নগন্য। ভাওয়াল অঞ্চলে বয়সে যারা ছোট- তারা বড়দের ডান হাত নিজেদের ডান হাতে ধরে কপালে ঠেকিয়ে সেলাম করেন। আঠারোগ্রামে ছোটরা নত হয়ে ডান হাতে বড়দের পা ছুঁয়ে সেলাম করেন। তাছাড়া এ দু'এলাকার লোকদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে চিন্তা-চেতনা ও সামাজিক রীতিনীতিতে। ১৯৫৮-১৯৬৪ খ্রীঃ এসব পার্থক্য প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করেছি বান্দুরা সেমিনারীতে থাকাকালে। "ওরা তো ভাওয়াইল□া।" "ওরা তো ভাওয়ালের লোক।" তৎকালে এ কথাগুলোর মধ্যে আঠারো গ্রামবাসীদের এক ধরনের আত্মম্ভরিতা- এক ধরনের শে□ষ এবং এক ধরনের ছোট করে দেখার ভাব ছিল। এর কারণ কি? কারণগুলোর মধ্যে ছিলঃ পারস্পরিক আদান-প্রদানের অভাবঃ তৎকালে ভাওয়ালবাসীগণ ভাওয়ালে এবং আঠারোগ্রামবাসীগণ প্রধানতঃ তাদের নিজস্ব এলাকায় সীমাবদ্ধ জীবন যাপন করতেন। তাদের মধ্যে যথেষ্ট যোগাযোগ ও আদান-প্রদান হবার সুযোগ ছিল কম।

আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্যঃ

ভাওয়ালের গ্রামবাসীগণ একটু বেশী টেনে টেনে কথা বলেন- যেমনঃ "এ্যা-হে- কে-ম-ন আ-ছে-ন?" "ক-ই যা-ই-তা-ছে-ন?" এ-ম-রা (এদিক) দিয়া না গিয়া হে-ম-রা (ওদিক) দিয়া যান।" "এ্যা-নো (এখানে) আ-ই-ও (আস)"। আঠারোগ্রামবাসীদের কথার মধ্যেও টান আছে- তবে তা এত দীর্ঘ নয়। তাদের আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে আছে।ঃ "যাইবার নইছে?" "হপায় নাইন্দে আইলেম (এই মাত্র রেঁধে আসলাম)" "নাইত্তে নেজার করবা না? (রাত্রে প্রার্থনা করবে না?)" "নূর পারবার নইছস্ ক্যা? (দৌড়াচ্ছ কেন?)"।

যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতির অভাবঃ

ভাওয়ালবাসীগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী ছিলেন বলে তাদের হাতে সর সময় যথেষ্ট টাকা পয়সার আমদানি ছিল না। যথেষ্ট অর্থকড়ির অভাবে তাদের খুব কম সংখ্যক লোক হাইস্কুলের পরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াব সুযোগ পেয়েছেন। অন্যদিকে আঠারোগ্রামবাসীদের অনেকেই ছিলেন কোলকাতা- দিল□ী- বোম্বাই- করাচী- লাহোর এবং পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন নগরীতে রন্ধন শিল্পে কর্মরত। তারা হাইস্কুলের পড়াশুনা শেষ না করেই বিদেশে পাড়ি জমাতেন। মাসে মাসে বেতন পাওয়ায় তাদের হাতে সবসময়ই কাঁচা পয়সা ছিল। ফলে টাকার যে একটা গরম আছে তা স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পেতো। ভাওয়ালবাসীদের যারা কিছু টাকা সঞ্চয় করতে পারতেন- তারা তা দিয়ে অল্প করে হলেও গ্রামে জমি ক্রয়ের কাজে ব্যয় করতেন। অন্যদিকে- পাকিস্তানী আমলে আঠারোগ্রামবাসীদের হাতে এত পরিমান টাকা পয়সা ছিল যে- ইচ্ছে করলে তারা তখন ঢাকা শহরের অর্ধেকেরও বেশী জমি কিনে ফেলতে পারতেন। কিন্তু বেশি কিছু হয়নি- কারণ তখনও টাকা সঞ্চয় করার মানসিকতা ও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। বহুদিন পরপর বিদেশ থেকে ছুটিতে বাড়ী ফিরে অনেকে দেদারছে অর্থকড়ি খরচ করতেন- ঘন ঘন পার্টি- পানভোজন- উপহারদান ও বাহুল্য ব্যয়ে। একজনের কথা জানি- যিনি দৈনিক কাঁচা বাজার ও আনুষঙ্গিক বাবদ বান্দুরা বাজারে খরচ করতেন প্রায় ৭০ টাকার মত। তখন চাউলের দাম ছিল আট আনা (৫০ পয়সা) সের- দুধের সের চার আনা (২৫ পয়সা)- এবং রসগোল□ার সের প্রায় এক টাকা। ছুটি শেষে দেখা গেল তিনি ধার-কর্জ করে পুনরায় মধ্যপ্রাচ্যের চাকুরীতে ফিরে যাচ্ছেন।

গেঁয়ো ভাবত্বঃ

স্বল্প শিক্ষা ও চাষবৃত্তির কারণে অধিকাংশ ভাওয়ালবাসীগণ আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় গেঁয়ো ভাবাপন্ন ছিলেন। অন্যদিকে আঠারোগ্রামবাসীগণও হাইস্কুলের পড়া সমাপ্ত না করেও চাকুরীর উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি জমানোর কারনে গেঁয়ো ভাবটি বেশ কাটাতে পেরেছিলেন। ফলে তাদের অনেকে ভাওয়ালবাসীদের প্রতি একটু কৌতুকপূর্ণ ও অবজ্ঞার ভাব পোষন করতেন। উলে□খ্য যে- পাকিস্তানী আমলে ভাওয়ালের কিছু সংখ্যক তরুনী আঠারোগ্রামঞ্চলে বিবাহিত হন। কিন্তু বিয়ের জন্য আঠারো গ্রামের মেয়ে পাওয়া প্রায় অসাধ্য ছিল। একজন শিক্ষিত ভাওয়ালবাসী আঠারোগ্রামের এক তরুনীকে বিবাহ করতে চাইলে তার পিতা আত্মম্ভরে বলেছিলেনঃ "আমরা ভাওয়াল থেকে মেয়ে আনি [কারণ তারা খাঁটতে পারে]- কিন্তু আমাদের মেয়েদের ভাওয়ালে বিয়ে দেই না [কারণ সেখানে গিয়ে তাদেরকে নিজ হাতে সব কাজ করতে হবে]।"

ভাওয়াল বনাম আঠারোগ্রামঃ

অবস্থান পরিবর্তন ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তি বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের বিরুদ্ধে গোরিলা যুদ্ধে নামেন। তাদেরকে নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল। একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সরকারের কাছে অস্ত্র জমা দেবার নির্দেশ থাকলেও অনেকেই তা করেননি। পরে কেউ কেউ এসব অস্ত্র অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করেছেন। অপরাধমূলক কাজের মধ্যে ছিল ডাকাতি ও রাহাজানি। স্বাধীনতা পূর্বে আঠারোগ্রামঞ্চলে মাঝে মধ্যে ডাকাতির কথা শুনা যেতো। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে এর সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। এ ডাকাতির ভয়ে ও নিরাপত্তার খাতিরে তাদের অনেকে পরিবার পরিজন নিয়ে ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। ক্রমান্বয়ে তারা জমি ক্রয় করে বাড়ী তৈরী করতে থাকেন। এভাবেই তেজগাঁও অঞ্চলের ইন্দিরা রোড ও মনিপুরিপাড়া এলাকায় এবং কাফরুল ও মহাখালীতে ও কাথলিকদের বড় বড় গৃহ নির্মিত হয়। ঢাকায় বসবাসের ফলে আঠারোগ্রামবাসীগণ গির্জায়- স্কুল-কলেজ- সংঘ-সমিতিতে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে ভাওয়ালের কাথলিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের সুযোগ পান। ফলে ইতিমধ্যে দু'পক্ষের মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝি ও বৈষম্যমূলকভাব ভেঙ্গে গিয়ে বেশ সমঝোতার সৃষ্টি হয়েছে। এখন দু'পক্ষের মধ্যে অধিক সংখ্যক হারে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হচ্ছে। এখন শিক্ষা-দীক্ষা- চাকুরী ও ব্যবসা ক্ষেত্রে ভাওয়াল ও আঠারোগ্রাম সমতালেই চলছে।

উপসংহারঃ

আগেকার ভাওয়াল ও এখনকার ভাওয়ালের মধ্যে বহু তফাৎ বিদ্যমান। সামাজিক- শিক্ষাগত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এখন প্রকটভাবে দৃশ্যমান। আগামী ২০ বছরের মধ্যে ভাওয়ালের ধর্মপল□ীগুলো ক্রমাবর্ধমান ঢাকা মহানগরীর শহরতলীতে পরিনত হবে। গ্রামের শান্ত-সমাহিত এলাকা হয়ে উঠবে প্রাণাচঞ্চল ও কোলাহলপূর্ণ। এ অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য আমাদের মানসিকভাবে অবশ্যই প্রস্তুতি নিতে হবে। (তথ্যসূত্রঃ ভাওয়াল জমিদারী সম্পর্কিত তথ্য Bangladesh.org থেকে)।

একান্নবর্তী পরিবার

রুবি গাঙ্গুলী- নিউজার্সী

প্রাচীন কাল থেকেই একান্নবর্তী পরিবার আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মাথা ছিল। একান্নবর্তী পরিবারের সদ্যসরা একসঙ্গে বসবাস করার ফলে নিজেদের আনন্দ- বেদনা ও প্রয়োজনীয়তা ভাগ করে নিতে পারে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে। আদিকাল থেকে এই একান্নবর্তী পরিবার ছিল আমাদের পারিবারিক কাঠামো। একান্নবর্তী পরিবার সবাইকে এক সূত্রে গেঁথে রাখে। পরিবারের সদ্যসরা নিজেদের আনন্দ ও বেদনা ভাগ করে নেয়ার মাঝে তারা খুজেঁ পায় জীবনের আনন্দ ও স্বার্থকতা। একান্নবর্তী পরিবারের স্বাধীনতা এবং শাসন এই দু'য়ের মাঝে থাকে নিয়ম কানুন। পরিবারের সব সদস্যের প্রতি সম্মান দেখানোর মন মানসিকতাটি সবাইকে এক সঙ্গে এক পরিবারে- আনন্দে রাখে। যৌথ পরিবারে- সন্তানদের একটা সুন্দর পরিবেশ দেয়া যায়। সন্তানরা একসঙ্গে বসবাস করার ফলে বড়দের প্রতি সম্মান- শ্রদ্ধাবোধ এবং সমবয়সী ও ছোটদের প্রতি আদর ও স্নেহ করতে শেখে। কারণ বাবা মায়ের পাশাপাশি তারা দাদা-দাদী- নানা-নানী- কাকা-কাকীমা- পিসিমা জ্যেঠা ও জ্যেঠিমা সবার আদর ও স্নেহ পাচ্ছে আবার আবদার করার সুযোগও পাচ্ছে। এবার সেই সাথে সবার শাসনও পাচ্ছে। কোন ভুলত্রুটি হলে সবাই হাতে ধরে শিখিয়ে সংশোধন করে দিচ্ছে ভুলটা। যখন কোন শিশু অন্যদের সঙ্গে থাকে তখন তারা শেয়ার করতে শেখে এবং বড় হয়ে উদার হতে শেখে। অর্থাৎ শিশু কখনো মানসিক দিক থেকে একাকিত্ব ভোগে না। সুতরাং শিশুর মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে একান্নবর্তী পরিবার খুবই ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবার থেকে শিশুরা শুধু ভাল বিষয়গুলো শেখে তা নয়- কিছু কিছু খারাপ বিষয় ও শিখতে পারে। তবে তুলনামূলকভাবে তার পরিমান খুবই কম। একান্নবর্তী পরিবার সব কিছুই যে ভালো তা নয়। মত পার্থক্যের কারণে সর্ম্পকের চরম অবনতি হতেও দেখা যায়। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মানসিকতার পার্থক্য স্থানাভাব- ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব প্রভৃতি কারণে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙ্গে যায়। আজকাল একান্নবর্তী পরিবার প্রায় নেই বললেই চলে। একান্নবর্তী পরিবার প্রথা আমাদের আদি গাঁথুনী হলেও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। দিন বদলে গেছে- মানুষের চিন্তা ভাবনাও বদলে গেছে। সময়ের চাপে একান্নবর্তী পরিবারের কাঠামো আজ অনেকটাই বিলুপ্তির পথে। বিশেষ করে শহরে। আজকাল একক পরিবার প্রথাই সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বলা যায়। একক পরিবার মানুষকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। এবার এর পরিপ্রেক্ষিতে একক পরিবার কেড়ে নিয়েছে মানুষের অনেক মূল্যবোধ- বিশেষ করে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য- সহনশীলতা আর ধৈর্যের মতো অনেক গুনাবলী। আজকাল অধিকাংশ নারী চাকুরী করছেন। সুতরাং তাদের সন্তানদের কাজের লোকের কাছে রেখে যেতে হয়। কাজেই বাবা-মা ভীষন দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকেন। সন্তানদের এবার নিজেদের ঘর-বাড়ির নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা তাদের স্বস্থি দেয় না। কাজেই পরিবার যদি বড় হয় তাহলে সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তার অবকাশ অনেক কমে যায়। একক পরিবারের শিশুরা শুধু বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকার কারণে নিঃসঙ্গতায় ভোগে। কারণ বাবা-মা যদি সন্তানদের সময় দিতে না পারেন তাহলেও সন্তানরা একাকীত্বে ভোগে। কাজেই এ অবস্থা শিশুর মানসিক বিকাশের পক্ষে অন্তরায়। পরিবার এক সঙ্গে থাকতে চাইলে অবশ্যই কিছু বৈশিষ্ট্য নিজেদের মধ্যে ধারন করতে হবে। সহনশীলতা এবং ধৈর্য্য হচ্ছে এর মধ্যে প্রধান। অবশ্যই অন্যের মতামত- চাহিদা ও সমস্যাকে গুরুত্ব দেয়ার মন মানসিকতা থাকতে হবে। পরস্পরের প্রতি সম্মান- উদারতা- সহনশীলতা এবং ভাল বসতি একান্নবর্তী পরিবার গড়ে তুলতে ও টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

My Determined Aspirations

Maria Rozario (Palkie)- Woodbridge- VA

Life is like that one jar of jellybeans which you could never fully estimate. It is as unpredictable as the English weather. Who knew that I would grow up in America and one day be able to vote for the commander in chief of the United States? I was a typical four year old- born and brought up in Dhaka- Bangladesh. Being a minority in our own nation was never very fulfilling for me and my family. My father sought for us a better life in a country where opportunities stemmed from the littlest of bulbs. Bangladesh is an overpopulated nation- with the size of the state of Wisconsin. It has a huge population of 130 millin people- mostly of Islamic faith. The state religion is also Islam. I- however- am a staunch Christian. Religious tolerance is a trait not many countries have in common. There are many evidences towards churches being vandalized and bombed in Bangladesh. Lets not forget to mention crucifixes being scorched into mere ashes. This is not the cause of our immigration however. We love Bangladesh with all our hearts. It will now and forever be my motherland. Proudly- I can claim my father's role in endangering his life to free our land from unwanted rule. So why did we leave the country for which my father took up arms to free our helpless people? The reason is very simple. It is the reason for which America is such a rich blend of cultures. The United States is the land of milk and honey. My father wanted a better life for his wife and three daughters. He brought us here so we can one day excel to the highest point of our potential without being discriminated for whatever reason. It was a bold and adventurous move but the pot at the end of the rainbow was worth taking the risk.

The inevitable challenge came after the never ending journey. Like always- in order to reach your goal- one must face many difficulties along the way. When we arrived- it was as if we had entered a magical land. America sparkled with luxury and beauty at every corner. Just the opportunity to see something new and exciting was reason enough to wake up for me. However- my reason to wake up bright and early seemed to fade not long after. Surely every kid despises waking up early to go to school- but it was much more agonizing for me than any other kindergartner.

Unfortunately- due to our living right in the heart of D.C- I had no choice but to go to Oyster Bilingual Elementary School. It was the closest to our house and "fortunately" had room for me to enroll. Imagine having to learn two languages at the same time. It was hard enough having to learn English- but having to learn Spanish simultaneously was simply painful. All the other kids were already advanced which made me feel extremely helpless. I was a four year old girl in a land far- far away from home- without any knowledge on how to communicate with my peers and teachers. All I could do was cry. Tears burned down my face as I watched my mother leave- disheartened- every morning. I would cry myself to sleep during nap time and cry when I had to go to the restroom- without being able to form my emotions into words. I was so desperately in need of attention and comfort.

The mockery from the other children stabbed me like sharp needles. I couldn't always understand what the were saying- but human nature is crystal clear. Their savage gestures and facial expressions revealed the cruelty within. Teachers weren't as patient and kind in contrast to meeting them the first day. As time went on- they grew tired of my constant need for repetition and visual aides. Despite all the hurdles along the way- I began sprinting to catch up with the rest of the crew. I pushed myself to learn both languages at the same time while keeping alive my native tongue. I'm not the greatest multi-tasker- but I learned that with a little ambition and a dash of aspiration- even a four year old can become trilingual in less than four months.

Getting my mouth to seal shut was impossible! I would constantly sing songs in Spanish and then translate them in English for my parents. It was easier for the rest of my family to adjust because they were all fluent in English. I- however- struggled and got the real doze of how it is like being completely oblivious in a foreign land. I do not rue this experience in any way. It shaped me for the upcoming events in my life. I learned how to strive for a goal and realized that I have the drive to fulfill anything my heart truly wishes to accomplish. In fact- facing this challenge at such a young age was beneficiary for me. I learned that my strengths involved striving for a quick fix when it came to challenges. I did not let the tears that had once filled my visage get in the way of my need to catch up with the natives.

Those who were once my enemy had soon changed their perspective when it came to judging me. I also found in myself a weakness- which I honestly do regret. The children who had been inconsiderate to me were never able to find a place in my heart. This was probably due to my age being the period of "black and white". They had once been cruel and unkind to me- which made me dislike them. Now I realize that holding grudges is completely a waste of time. I would not have been as unforgiving if I had the chance to relive that experience. Who knows- maybe I could have been good friends with some of them. However- this lack of harmony enforced the feeling of competition in me. I endeavored to prove to those who found me incompetent- that I can do even better than them if I try. Competition is a tool to achieve- though too much competition can consume one to unhealthy situations. There is a limit to everything good in this world of ours- but its up to us to set the limits which can enable us to soar to any peak we desire.

"A small body of determined spirits- fired by an unquenchable faith in their mission- can alter the course of history." -Mohandas Gandhi

বিশ্বাসের আরো এক ধাপ

চিত্রা প্যাস্কালিনা রোজারিও- নিউইয়র্ক

৩রা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার- ২০০৮ সালের প্রথম মাসের প্রথম সপ্তাহ- বেলা ১০:৩৬ মিঃ নিউজার্সীর নিউইয়ার্ক এয়ারপোর্টে পৌছে-ভিসা টিকিটের প্রয়োজনীয় কাজ সেরে- পরিবার পরিজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রতীক্ষায়- যাত্রীদের সাথে গিয়ে বসি- পরিচিত হলাম অপরিচিত তীর্থযাত্রার সঙ্গীদের সাথে। একটা উৎকন্ঠা- অধীর আগ্রহ- প্রবল উচ্ছ্বাস বুকে নিয়ে কান পেতে আছি কখন ডাকবে। এক সময় একে একে ১:৩০ মিঃ পে□নের নির্ধারিত সিট নিয়ে বসলাম- মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম ও আশীর্বাদ চেয়ে চোখ বন্ধ করে রইলাম- ১:৪৫ মিঃ দুপুর- পে□ন ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো। আকাশ সীমানায় উঁচু থেকে বহু উঁচুতে- শেষ পর্যন্ত তাহলে যাচ্ছি-- হারিয়ে গেলাম কিছু ক্ষণের জন্য। "বিশ্বাস" পবিত্র বাইবেল বলে তুমি যা প্রত্যাশা কর-তা তুমি পেয়েই গেছ (মার্ক ১১:১৪) বিশ্বাসের এই পরম নিগূঢ় তত্ত্বকে ঘিরে সকল সুসময়/অসময় প্রভুকে ডাকতাম। ছোট বেলায় যখন বাইবেল পড়তাম- গীর্জায় বানী পাঠ শুনতাম- ধর্ম ক্লাসে- মিঃ ইম্মানুয়েল সুন্দর করে যীশুর আশ্চর্য্য কাজ- যাতনাভোগ- ব্যাখ্যা করতেন তখন প্রায়ই বলতেন সেই গেৎসীমানী বন- যীশুর আশ্বর্য্য কাজের নির্দশনের চিহ্ন আজো ইস্রায়েল দেশে রয়েছে- তখন প্রায়শ:ই ভাবতাম-ইস- আমি যদি সেই যীশুর দেশে একবার যেতে পারতাম। আবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হতো সব ভাগ্যতো সুন্দরদের জন্য- ছোট বেলা থেকেই গায়ের রঙ্গের জন্য হীনমন্যতায় ভোগতাম-যা হোক বড় হয়ে যখন হাতে পাসপোর্ট পেলাম-তখন দেখলাম সেখানে স্পষ্ট প্রিন্ট লেখা। All countries of the world except Israel. লেখাটা দেখে মনটা খুবই খারাপ হয়েছিল। ২০০৩ সালে আমেরিকাতে এসে ২০০৬ সালের জানুয়ারী মাসে যখন গ্রীন কার্ড হাতে পেলাম তখন নতুন করে সেই পুরানো বাসনা জেগে উঠলো। ২০০৭ এর জুন মাসে যখন জানতে পারলাম ফাদার স্ট্যানলী ইসরায়েলে তীর্থ যাত্রীর দল নিয়ে যাবেন- যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর- ভিসা হাতে পেয়েও দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভয় শেষ পর্যন্ত যাওয়া হবে তো। এই সেই শুভক্ষণ যখন পে□নে উঁড়ছি- হঠাৎ ঘোষণা শুনতে পেলাম- সিট বেল্ট Please- চারপাশে তাকিয়ে সীট বেল্ট বেঁধে পাশে বসা লীনাদির সাথে হাসলাম। সর্বমোট ২০ জন তীর্থ যাত্রীর দল নিয়ে ফাদার স্ট্যানলীর পরিচালনায় পূণ্যভূমি দর্শনের পথে ১০ দিনের এই সফল যাত্রা সেই যীশুর দেশ ইস্রায়েল পে□ন উড়ে চললো- গল্প করতে করতে কখন ১০ ঘন্টা পার করলাম বুঝতেই পারলাম না। ৫:২৬ মিঃ সকাল ইস্রায়েল সময় পে□ন অবতরণ করলো পাশাপাশি বসা মিসেস লীনা রোজারিও এবং মিঃ রবার্ট গমেজ আদি বিশ্বাসের এক পরম সুখানুভূতিতে বিস্ময়ে সমস্বরে বলে উঠলাম শেষ পর্যন্ত প্রভুর দেশে আসতে পারলাম? খুশীতে চোখে জল এসে গেল -বারবার প্রভুকে ধন্যবাদ জানালাম-যে নিরাপদে পৌছতে পেরেছি। কেউ কেউ বললো নেমেই চুম্বন দিব- প্রণাম করবো- পে□ন থেকে নেমে Checkout এর সব কাজ সেরে এয়ারপোর্টে ভিতরে বড় বড় অক্ষরে লেখা Welcome to Israel এর সামনে গ্রুপ ছবি তুললাম-সকলের চোখে মুখে আনন্দ উচ্ছ্বাস।এয়ারপোর্টের বাইরে এসে আমাদের ১০ দিনের গাইড আনন্দ মিস- ইরিট অস্ট্রভস্কি এবং মটরকার ড্রাইভার খালিদের সাথে পরিচিত হই। মালপত্র তুলে ফাদার স্ট্যানলীর ধন্যবাদের প্রার্থনার মাধ্যমে ইস্রায়েলে আমাদের তীর্থযাত্রার প্রথম যাত্রাশুরু হয়।তখন বাজে সকাল ৭: ৫৮ মিঃ। বাস এগিয়ে যাচ্ছে পথের দু'ধারে সবুজ বনানী- কমলালেবুর বাগান- খেজুর বাগান দেখাতে দেখাতে আমাদেরকে নিয়ে চললো ভূমধ্যসাগরের তীরে পুরাতন জাফা শহর যেখানে সাধু পিতরের বাস ভবন ছিল। যেখানে এখন নির্মিত হয়েছে Church of St. Peter এখানে সাধু পিতর দর্শন পেয়েছিল সূচী/অসূচী খাদ্য সম্পর্কে (শিষ্য চরিত ১০:৯-১৬) সেখানে ফাদার ধন্যবাদের মীসা উৎস্বর্গ করেন। মীসা শেষে খুড়ে পাওয়া ২০০০ সালের / পূর্বের বাড়ীঘরের নিদর্শন দেখে আমাদেরকে হোটেলে নিয়ে যায়। রাত যাপন করে বাসে করে সিজারিয়া- কার্মেল পর্বত নাজারেথ ও কানা নগর বিয়ে বাড়ী পরিদর্শনে রওনা হই। সিজারিয়াতে তৃতীয় শতাব্দীর পুরানো থিয়েটার কেন্দ্র সেখানে ৪ হাজারের বেশী সিট ছিল-তার সংলগ্ন রাজা হেরোদের প্রাসাদ যা ভূমধ্যসাগর সংলগ্ন ব্যবসাবানিজ্যের সুবিধার্থে নির্মিত হয়েছিল- আজো সেই প্রাসাদের অস্তিত্ব রয়েছে-এই স্থানেই কর্নেলিউস নামে ইতালীর সৈন্যদলের শতপতি ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছিলেন এবং সাধু পিতর যীশুর মঙ্গলবাণী প্রচার করেছিলেন (শিক্ষাচরিত ১০ঃ ১-৪৩) অতঃপর কার্মেল পর্বত ১৭৪২ ফুট উঁচু ইলিসীয় ভাববাদীর গীর্জা যেখানে ঈশ্বর যজ্ঞ অনুষ্ঠানে আগুন পাঠিয়ে পরমেশ্বরকে জীবন্ত ঈশ্বর বলে পৌত্তলিক বায়াল দেবতার অনুসারীদের সামনে প্রমান করেছিলে (১ম রাজাবলী ২-৪০) যেখানে কার্মেল চার্চ ও কার্মেল মনোষ্টারী রয়েছে। উঁচু পর্বত চূঁড়াতেই ভাববাদীগণ ঈশ্বরের ধ্যান-পূজা করার জন্য বেছে নিতেন তা পূরাতন নিয়ম তথা নতুন নিয়মেই দেখা যায়। কার্মেল পর্বত থেকে আমরা যাই Basilica of the Annunciation সেখানে কুমারী মারীয়া ঈশ্বর পুত্রের মা হওয়ার সংবাদ পেয়েছিলেন- সেখানে ফাদার মীসা উৎস্বর্গ করেন- কুমারী মারী-য়ার সেই ঘর- সমাজ গৃহ- সমুন্নত রেখে নির্মিত হয়েছে নাজারেথে নগরের গীর্জা যা ১০৮০ ফুট উঁচু ছিল। নাজারেথ শহরেরর মধ্য দিয়ে আমরা যাই কানানগর বিয়ে বাড়ীতে যেখানে যীশু জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করেন -তা বর্তমানে The wedding Church তথা সাধু যোসেফের গীর্জা বলে পরিচিত। কানা নগর বিয়ে বাড়ীর গীর্জাতে আমাদের দলের ৫ দম্পতিকে বিয়ের প্রতীজ্ঞা নবায়ন করে আশীর্বাদ করেন। মীসা শেষে আমরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসি যেখানে যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বসেছিলেন + ঘরের মেঝে অবয়ব এখনো সমাসীন প্রার্থনা শেষে আমরা হোটেলে ফিরে আসি। ৬ই জানুয়ারী আমরা গেলাম গালীল সাগরের পাশে সেই পর্বত The Mount of Beatitucles সেখানে যীশু তাঁর অষ্টকল্যাণ বাণী দিয়েছিলেন (মনি ৫: ১-১২) সেখানে ফাদার মীসা উৎসর্গ করেন- সেখান থেকে আমরা যাই The Primacy Peter চ্যাপিলে যেখানে গালীল সাগরের তীরে প্রভু যীশু পুনরুত্থানের পর তৃতীয়বার শিষ্যাদের দেখা দেন (যোহান ২১-১-১৪) যে পাথরে বসে যীশু শিষ্যদেরসাথে ভোজন করেছিলেন- আমরা সেখানে প্রার্থনা মাধ্যমে মৃতঞ্জয়ী প্রভুকে আত্মিক ভাবে আরো একটিবার উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। সেই গালীল সাগরের পাশ ধরেই আমরা গেলাম আবগার নির্জন

স্থানে যেখানে যীশু পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে পাঁচ হাজারের বেশী লোককে খাইয়েছিল(মার্ক: ৩৩-৩৪) সেখানে থেকে কফনায়ম (মার্ক ৪ ঃ ১২-১৭- ১: ২১-৩৮) স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কফরনায়ুম-এর সমাজগৃহ ও সাধু পিতার শাশুড়ীর বাড়ী দর্শন করি- সেখানে আজো তৈলের জালা- পুরানো নির্দশন- যা যীশুর অলৌকিক কাজের সাক্ষ্য বহন করছে- যাহার প্রতিটি নির্দশন/উলে□খিত স্থানে বাইবেল বর্ণিত ঘটনা পড়ে শুনাতেন ও ব্যাখা করতেন- আমরা সেখানে স্বয়ং নিজেরাই উপস্থিত- বইয়ে বেড়াচ্ছি- স্পর্শ করছি- শুধু বিস্ময়। ৭ই জানুয়ারী আমরা তাবর পর্বত (১৮-৪৩ ফুট উঁচু) যেখানে যীশুর দিব্য রূপান্তর ঘটে/ (মার্ক ৯: ২-৮) এখানে এখন নির্মিত হয়েছে "Basilica of Transfiguration Church" -প্রার্থনা সেরে আমরা জর্দন নদীর সেই স্থানে- যেখানে যীশু সাধু যোহনের হাতে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন (মার্ক ১ ঃ ২-৮)। সেখানে ফাদার আমাদের সকলকে বাপ্তিস্ম নবায়ন করে জলে দীক্ষাস্নাত করেন। ৮ই জানুয়ারী আমরা গালীল প্রদেশ তথা তিবারিয়াস ছেড়ে যেরোজালেমের দিকে যাত্রা শুরু করি। পথিমধ্যে আমরা লোহিত সাগর (Dead Sea) সৈকত দর্শন করি। দুপুর ২: ০০ টায় আমরা পুরাতন যেরুজালেম নগরে জাগো জেরোজালেম জাগো-- করতে করতে প্রবেশ করি---অলিভ পর্বত-থেকে জেরুজালেম নগরীকে দেখলাম পাহাড় ঘেঁষে হাজার হাজার যিহুদীদের কবর-যারা এখনো বিশ্বাস করেন মশীহ আসবেন। দেখলাম স্বর্ণ মন্দির- অশ্রুজল মন্দির- জেরুযালেম মন্দিরের প্রাচীন- ফিদারান ভেলী- ফাদর অশ্রুজল মন্দিরে মীসা উৎসর্গ করেন-এই স্থানে এসে যীশু মন্দিরের দিকে তাকিয়ে কেঁদেছিলেন। নগরীর মুরায়াত পর্বতের উপর নির্মিত স্বর্ণ মন্দির যেখানে আব্রাহাম তাঁর একমাত্র সন্তান ইসহাককে বলী দিতে নিয়েছিলেন- যেখানে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা রক্ষিত ছিল- যে নগরীতে যীশুর চরম কষ্টভোগ- মৃত্য পুনরুত্থান হয় সেই নগরীতে আমরা ৫দিন অতিবাহিত করি। জানুয়ারী ৯- আমরা যীশুর জন্মের স্থান বেথলেহেমে পোঁছাই- সে স্থানে যীশু জন্মেছিলেন যেখানে যীশুকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল- আমাদের সঙ্গী মিসেস সাবিনা গমেজ অভিভূত হয়ে মূর্ছা যায়-ঈশ্বরের কৃপায় অল্পতেই সুস্থ হয়ে যীশুর জন্মের স্থান প্রণাম করে- সেখানে একের পর এক গ্রুপ করে হাজারো মানুষের মেলা- মহা মানবের জন্মস্থান চুম্বন/স্পর্শ করে পরম তৃপ্তি নিয়ে গুহা মুখে বাইরে বের হয়ে আসি- সাধু জেরোমের চ্যাপিলে ফাদার বড়দিনের মীসা উৎসর্গ করেন।দুপুরের আহার সেরে আমরা জাখারিয়ার বাড়ী যেখানে সাধু এলিজাবেথ মারীয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন (লুক ১: ৩৯-৫৫) এই স্থানটিও পর্বতের চূঁড়াতেই ছিল-আমাদের সাথে যারা বয়স্ক ছিলেন মিঃ যোয়াকিম- মিসেস সাবিনা সাহসে ভর দিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে আসতে পিছু পা হয়নি। তাদের গভীর বিশ্বাস- তাদেরকে শক্তি দিয়েছিল বলেই কোথাও কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েনি। অত:পর বেতসা গ্রামে জলকুন্ড দর্শন করি- যেখানে যীশু রোগীকে সুস্থ করেন যিনি ৩৮ বৎসর ধরে ভুগছিলেন (যোহন ৫ ঃ ১-৯) বর্তমান অবস্থান থেকে ১০ ফিট নীচে সকল নিদর্শন এখনো অটুট আছে। জেরুসালেমের যে ঘরে যীশু তার শিষ্যদের নিয়ে শেষ ভোজ করেছেন ও শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে ছিলেন- সেখানে ফাদার আমাদের সকলের পা ধুয়ে দিয়েছেন। অতঃপর কায়ফায় বাড়ী- যে খাম্বায় যীশুকে বেঁধে রাখা হয়েছিল- তা স্পর্শ করার সৌভাগ্য -এর কথা ভেবে ঈশ্বরকে মনেমনে ধন্যবাদ দিলাম- গেৎসীমানে বনে-যা অলিভ গার্ডেন নামে পরিচিত-দু-হাজার বৎসরের পুরানো গাছ এখনো যেন যীশুর কষ্টের সাক্ষ বহন করছে- পাশেই গীর্জা-যে পাথরের উপর বসে যীশু প্রার্থনা ও ধ্যান করেছিলেন তা সেখানে রাখা আছে। কায়ক্ষায় বাড়ী যীশুর বিচার (সোহান ১৮ঃ ১৫-১৭ পিতরের তিনবার অস্বীকারের স্থান (লুক ঃ ৬৩-৬৬) দর্শন করি। যীশুকে ভারী ক্রুশ ও কাঁটার মুকুট পরিয়ে বাজারের ব্যস্ততম সড়ক দিয়ে গলগাঁথা নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল-ক্রুশের পথের ১৪ ধাপ আমরাও জীবন্ত ক্রুশের পথের মাধ্যমে হেঁটে হেঁটে- খুলীতলা নামক স্থানে পৌছাই- সেখানে যীশুকে ক্রুশারোপিত করা হয়- ক্রুশ থেকে নামিয়ে যে স্থানে যীশুর দেহ শায়িত করা হয়েছিল- সেখানে যীশুকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল সে সমস্ত পবিত্র স্থানে প্রার্থনা ও যীশুর ধন্যবাদ করি। সেখানে The Church of the Holy Sepulcher ফাদার পূন্য শুক্রবার এর স্মরনার্থে মীসা উৎস্বর্গ করেন। বড়দিনের সেই অনুভূতি যীশুর যাতনাভোগের সমস্ত নিদর্শন মনের অসারতাকে আরেক বার স্মরণ করিয়ে দেয়। ১১ই জানুয়ারী- আমরা কুমারী মারীয়ার শায়িত মূর্তি (সেখানে মা মারীয়া ঘুমিয়ে ছিল- সশরীরে স্বর্গে উন্নীত হয়) সেখানে দর্শন শেষে মীসা উৎস্বর্গ করেন। দুপুর বেলাতে জেরুজালেমের পুরাতন মন্দির Golden Temple যার দেয়াল ঘেঁষে খ্রীষ্টান মুসলীম- ইহুদী প্রার্থনা করছে- অনেকেই উদ্দেশ্য লিখে দেয়ালের গায়ে আটকিয়ে আসে- আমরাও করেছি- "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর"। ১১ই জানুয়ারী Notre Dame of Jerusalem গীর্জাতে পুনরুত্থান পর্ব ও ধন্যবাদের মীসার মাধ্যমে আমাদের দশদিনের তীর্থ যাত্রার সমাপ্তি হয়। ইস্রায়েল রাত ৯টায় এয়ারপোর্ট এ আসি। অনেকের ব্যাগ চেক করেছে- ব্যাগ গুছাতে আমি বড়ই দুর্বল- তার উপর যে লাইনে ব্যাগ চেক করে সেখানে পাঠিয়ে দেয়- ঈশ্বরের কৃপায় ইস্রায়েল বা নিউইয়র্ক বিমানবন্দরে কোথাও খুলেনি যদিও মূল্যবান এর মধ্যে মোমবাতি- কানানগরের ওয়াইন- লোহিত সাগরের মাটি ছিল। যা হোক সুস্থ শরীরে ২০ জনের এই দল প্রভুর দেশের এক পরম সুখানভূতি নিয়ে পরিবারে ফিরে আসি। দশদিনের এই সফরে প্রতিবারই মিসা উৎস্বর্গের সময় ফাদার স্মরণ করিয়ে দেয়- এই পূণ্য ভূমিতে সকলে আসার সুযোগ পায়না - কেবল পূণ্যভুমিতে যাকে/ যাদের মনোনীত করেন তারাই শুধুমাএ আসতে পারেন- স্বয়ৎ মোশীও ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত দেশে যেতে পারেনি- অন্যদিকে পূন্যভূমি দর্শন করেছি বলেই যে মহাপূন্যবান/পূন্যবতী- বা সকলের চাইতে আলাদা তা নয়---------- বড় বিষয় এই যে- ইশ্বরের ক্ষুদ্র সন্তান হিসাবে পূন্যভূমি দর্শন করে কতটা পূন্য অর্জন করছি জানিনা তবে ছোট বেলা থেকে যে স্বপ্ন ছিল সেখানে যাবার সুযোগ- যীশুর বাল্যকাল/কর্মকাল নিদর্শন দেখার সুযোগ- স্পর্শ করেছি- এটা হলো স্বার্থক বিষয় যা যীশুর বাণীকে নতুন করে ভাবতে বুঝতে আরো উদ্দীপিত করছে। এই পৃথিবীতে আমরা অতিথি মাত্র আমরা ধনসম্পদ লোভ লালসায়- অহঙ্কার এর বশবর্তী হয়ে নিজের ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে বিশ্বাসের দোলনায় দোদুল্যমান হই- কিন্তু প্রবল ইচ্ছা- মানুষের চেষ্টা/ ইচ্ছাকে/ বিশ্বাসকে আত্মিক প্রেরণার নতুন দিগন্তের পথে নিয়ে যায় (সোহান ১৪:১৩১৮ "তোমরা আমার নামে যা কিছু যজ্ঞ কর তবে আমিই তা পূরণ করবো")। আমাদের এই গ্রুপের ২০ জনের প্রার্থনা সকলের জন্য আমাদের মত অন্যরা যা আশা করেন ঈশ্বর যেন তাদের আশা পূরণ করেন। পরিশেষে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধেয় ফাদার স্ট্যানলীকে অশেষ ধন্যবাদ তীর্থ যাত্রার এই গ্রুপে আমাকে সুযোগ দেয়ার জন্য।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে প্রবাসী নেতৃত্ব
ওয়াশিংটনে ভেলেংকানী মায়ের পদতলে তীর্থের আয়োজন

সুবীর এল. রোজারিও কুইন্স- নিউইয়র্ক।

সে দিন প্রভাতে সূর্য্য উঠেছিল। ভূবন আলোকিত হয়েছিল। ভোরের পাখী গান গেয়েছিল। কিন্তু একটু পরে আকাশে সূর্য্য আর দেখা যায়নি। আকাশ ছেঁয়ে যায় মেঘোমালায়। তবে বর্ষণ হয়নি। তাপদগ্ধ গ্রীষ্মের অবসান ঘটেছে। এসেছে ঝরাপাতার দিন। প্রকৃতিতে তাই খানিকটা শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে। বাগানের প্রস্ফুটিত নানা বর্ণের ফুলগুলো বিবর্তনের পালায় তারা আজ একে একে স্তিমিত প্রায়। কেউ বা ইতিমধ্যে ঝরে পড়েছে পথের ধারে। প্রকৃতিতে যখন ঋতু বিবর্তনের এই লীলাখেলা চলছে সেমুহূর্তে প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন আয়োজন করেছে এক ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচী– ওয়াশিংটন ডিসিতে ভেলেংকানী মায়ের পদতলে এক তীর্থ যাত্রার। সেদিন ছিল ১৩ই সেপ্টম্বর- ২০০৮। ভারতবর্ষের ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের ১১তম বার্ষিক তীর্থের দিন। প্রবাসী সে সুযোগ গ্রহণ করেছে–যা চমক সৃষ্টিকারী ও উত্তম বলে অনুমিত হয়েছে। এই পদক্ষেপ প্রবাসীর ইতিহাসে যেন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। প্রবাসী যেন তার নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। যেখানে চিরকাল বাস করতে হবে সেখানকার জন্য নীড় রচনা এই পৃথিবীতেই শুরু করতে হবে। এই যেন চিন্তা। দ্বিতীয়তঃ এই কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে অপর একটি বিষয় পরিস্ফুটিত যে- আধ্যাত্মিকতা দিয়েই সমাজকে ঘিরে রাখতে হবে। কারণ বাহিরের কোন কোন সংস্কৃতি অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। ইতিমধ্যে আমরা অনেকেই হারিয়েছি– আর নয়। যেন এই চেতনার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে প্রায় শত সদস্য/সদস্যার সমন্বয়ে ওয়াশিংটন অভিমুখে তীর্থের লক্ষ্যে যাত্রার আয়োজন করা হয়। সকাল ৮ ঘটিকায় বাস ছেড়ে যায় তীর্থের উদ্দেশ্যে। নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন দীর্ঘ পথ। কিন্তু প্রবাসী উপদেষ্টা মিসেস শিলা রোজারিও আমাকে বলেন- "বাসের অভ্যন্তরে প্রার্থনা- গান- কৌতুক- অভিনয়ের ফলে দীর্ঘযাত্রা সংক্ষিপ্ত ও আনন্দময় হয়ে ওঠে।"

তীর্থে যাত্রা সর্বদাই অতি তাৎপর্যমন্ডিত বিষয়। কেহ কেহ বলেন- এই যাত্রা মানসিক প্রশান্তি- রোগমুক্তি ও পাপ–তাপ বিমোচনের একটি উপায়। ইহাতে আত্মগঠন ও নৈতিক উন্নয়ন ঘটে। এই তীর্থের মাধ্যমে উন্নত নৈতিক ও মানবীয় গুনাবলী অর্জন সম্ভব। তাই বলা হয় তীর্থ যাত্রা একটি আত্মিকযাত্রা (A Spiritual Journey)। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় যুগে যুগে নিজ জীবনের বাস্তবতা ও অর্থ খুঁজে পাবার প্রত্যাশায় মানুষ বারে বারে গিয়েছে তীর্থে। খুঁজে পেয়েছে নিজ জীবনের মূল্যবোধ ও বাস্তবতা। আবার কেহ কেহ বলেন- তীর্থ হলো আত্মশুদ্ধির সময়। পরচ্চা ও পরনিন্দা ছেড়ে এসময়ে নিজেকে ভাবার সময়। এই ভাবনার মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করে। ঈশ্বরকেও অধিক জানতে পারে। ঈশ্বরকে জানা হলো নিজ জীবনে আনন্দ–সুখ ও শান্তি উপলব্ধি করা।

বন্ধুবর জন বাড়ৈ–এর অনুপ্রেণায় আমি এই তীর্থে অংশগ্রহণ করি। কিন্তু আমি যখন সপরিবারে তীর্থস্থানে পৌঁছি তখন প্রবাসী তীর্থ যাত্রীরা সকলেই ইতিমধ্যে তীর্থস্থান ত্যাগ করেছে। আমি দেখেছি অসংখ্য ভারতীয় ও সিংহলী খ্রীষ্ট বিশ্বাসী নিজ নিজ সংস্কৃতি অনুযায়ী পোশাক পরিচ্ছেদে আবৃত হয়ে তীর্থে অংশগ্রহণ শেষে আপন আত্মীয় পরিজনের সাথে মিলিত হয়েছে তীর্থের বিস্তীর্ন শ্যামলমাঠে।

নীরবে অর্ধশত বর্ষে পা দিয়েছে ভেলেংকানী মায়ের এই তীর্থস্থল। ছবির মত সুন্দর স্থানে দাঁড়িয়ে আছে ভেলেংকানীমা। চারিদিক উজ্জ্বল আলোকিত। ভক্তের প্রেম-ভালবাসা- পত্র-পল□বে- ছায়া-নিবিড়তা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রতি বছর এক মিলিয়ন খ্রীষ্ঠভক্তের সমাগম ঘটে এই তীর্থে। ইহা বছরের ৩৬৫ দিন উন্মুক্ত থাকে ভক্তদের জন্য। প্রতিদিন ছয়টি পবিত্র মীসা উৎসর্গ হয়ে থাকে। ফলে প্রতিদিন সমাবেশ ঘটে বহু পুন্যার্থীর। বিগত ১৬ই এপ্রিল- ২০০৮ সালে পুণ্যপিতা পোপ বেনেডিক্ট এই তীর্থস্থল পরিদর্শন করেন ও প্রার্থনা করেন।

গির্জার অভ্যন্তরে অসংখ্য যজ্ঞ নিবেদনের বেদী তার ঠিক উপরে ঝুলন্ত পবিত্র মূর্তি- সিলিং ও দেয়ালে শিল্পীর নিপুন হাতে খোদিত অসংখ্য সাধু-সাধ্বীর মূর্তি দর্শন যে কোন ভক্তের হৃদয়কে স্পর্শ করে। প্রধান ফটকে খোদিত যীশুর শিষ্যদের মূর্তি ক্ষণিকের জন্য হলেও ভক্তের হৃদয়ে কথা বলে উঠে- হৃদয়ে জেগে উঠে উদারতা ও আধ্যাত্মিকতার তৃষ্ণা- নিমিষে মনের মধ্যে পরলোকের কথা এসে যায়- ফলে পাপ-তাপের প্রতি জাগে ঘৃণাবোধ- হৃদয়ে আসে মন-পরিবর্তনের ঢেউ- যে ঢেউ ক্রমাগতভাবে আছড়ে পড়তে থাকে হৃদয় মাঝে। ফলে হৃদয়ে বাঁধে অবিরাম দ্বন্দ ও সংঘাত। তখন প্রশ্ন জাগে- আমি কে? কোথায়ই বা আমার গন্তব্য?

দিনের আলো লুপ্ত হয়ে কখন যে চারিদিকে সন্ধ্যা নেমেছে তার টের পাইনি। সন্ধ্যার লজ্জাবতী তারকাগুলো যখন আকাশের কোলে জেগে উঠেছে- আমি তখন মুগ্ধনয়নে ভেলেংকানী মায়ের পানে শেষবার তাকিয়ে বাড়ি ফিরি। প্রবল বাতাসের শো-শো-শো শব্দের মধ্যে আমার গাড়ী দ্রুত এগিয়ে চলেছে নিউইয়র্কের পথে- আর আমি ক্রমাগত ভাবছি- এই পৃথিবী লোভ-লালসায় পরিপূর্ণ- ভোগ বিলাসে মত্ত- বিত্ত-বৈভব ও ক্ষমতার দর্পে গর্বিত- পাপ-তাপ ক্লিষ্ট মানব জাতির মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ও পরকালের চিন্তা চেতনারস্তর বৃদ্ধিতে তীর্থযাত্রা একান্তই সহায়ক। ইহাকে একটি নিয়মিত ও সুপরিকল্পিত কর্মসূচীতে রূপান্তরিত করা হোক।

বিশেষ ঘোষনা

আপনি বিশ্বের যে কোন প্রান্তেই বাস করুন না কেন আপনার লেখা গল্প, কবিতা, ছড়া, সমীক্ষা আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানতে পাঠিয়ে দিন। আপনার নবজাত শিশুর ছবি, কমিনিওনের ছবি - নাম, তারিখ। শিক্ষাক্ষেত্রে সন্তানের বিশেষ কৃতিত্ব। নব-দম্পতির ছবিসহ নাম, স্থান। ২৫তম/৫০তম বিবাহ বার্ষিকীর ছবি, নাম/তারিখ/স্থান আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে, আমরা তা তেপান্তরীতে ছেপে দেব।

ঠিকানাঃ **PBCA** PO Box-1568 New York, NY 10159-1568
E-mail: sgomes06@yahoo.com
sgomes99@gmail.com

১২ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কীর্তনের ইতিহাস

কীর্তন দলের ইতিহাস ১৯৯৩ সালে আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন মিলে প্রকাশ্যে কীর্তনদল তৈরী করে ডিসেম্বর মাসে কীর্তনে বের হই। তখনকার সময়ে মনে হতো কীর্তনদল প্রবাসীর একটি পরিবার। এই পরিবারে আবাল, বৃদ্ধ্যা-বৃদ্ধ যুবক- যুবতী শিশু সহ সকলে মিলে কি আনন্দেই না মেতে উঠেছিলো। প্রভু যীশুর আগমন বার্তা প্রবাসীর ঘরে ঘরে পৌচ্ছে দেবার এক বার্তা নিয়ে শুরু হয়েছিলো। মিঃ সুবীর রোজারিও তখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার সহযোগিতার শুভ্রারে তার হাতে গড়া দল নিয়ে চলে ছিলো আমাদের জীবন যাত্রা। কারো কারো কথা না বললেই নিজেকে দোষী বলে মনে হয়, তাই এই লেখা। শুভ্রা রয়, সুবল কস্তা, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের এই ফল আজও আমরা বয়ে নিয়ে চলছি। মিঃ লরেন্স ডি কস্তা আঙ্গুল রক্তাক্ত অবস্থায় ঢোলের সে মধুর শব্দ আজও আমাদের কানে বাজে। মিঃ আনড্রেস ডি কস্তার লেখা, মধুর সুর দেওয়া গানগুলি দিয়ে শুরু হয়েছিলো কীর্তনের জীবন যাত্রা। মহরাতে গান গাইতেন পারুল গমেজ শুভ্রারে। আমরা সকলে তাদের সুরের টানে পিছনে গেয়ে চলতান গান। জেমসরে ও গেভস্ট সরকারের জয় যীশু বলাটা আমাদের গানের জোর আরো বেড়ে যেত। মিঃ সুবল বাবুকে জেমসকে ফোন করে কুশল আদি জানাবার জন্য কথা বলে এই কীর্তন দলের সূচনা বের করেন। আমাদের প্রবাসীর কাছে তখন সামান্য টাকা কিভাবে বড়দিনের অনুষ্ঠান হবে এই চিন্তায় তখন সবাই চিন্তিত তখন মাথায় এলো এই কীর্তন। সেদিন সবে মাত্র আমি ও আমার স্বামী-সন্তান কোলে শিশু চাচের সঙ্গে স্টেনান আইল্যান্ড থেকে কীর্তন করে ঘরে ফিরেছি ঠিক তার কিছু সময় পরে জেমস রয় ফোন করে কুশল আদি মেনে সিদ্ধান্ত নিলেন আমরাও কীর্তন করবো। তখন শুধু চিন্তা সকলের মাঝে প্রবাসীর মঙ্গলের। আর যে কথা সেই কাজ। শুরু হলো কীর্তনের যাত্রা। প্রিঞ্জন, খ্রীষ্ট, এলিসান, জেসি, জেরি, এ্যানী, দিবর, দিব ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে এতো শীতের মাঝে চলছে আমাদের কীর্তন চর্চা। মিঃ আনড্রেস ডি কস্তা এতো বুড়া মানুষ কিন্তু প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে কীর্তন মহড়া দিয়ে চলেছেন। প্রথম বৎসর আমরা সকলে মিলে ধন্যবাদ দেবার জন্য জনসন হাইডের মেঘনা রেস্টুরেন্টে জড় হয়েছিলাম। এই মিলন মেলায় আমাদের সমস্যা ও সমাধানের উপায় বের করার জন্য আমাদের গত কেবিনেটের প্রেসিডেন্ট ও তার সহ কর্মীদের ডেকে ছিলাম। তাদের কথা আমাদের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে। গত হয়ে গেছেন প্রেসিডেন্ট ভিনসেন্ট গমেজ। এরপরের প্রেসিডেন্ট কিশোর গমেজ, এর পরের প্রেসিডেন্ট লরেন্স ডি কস্তা, এরপরের প্রেসিডেন্ট সুবীর রোজারিও। মিঃ ভিনসেন্ড গমেজ আমাদের কথা দিয়েছিলেন তিনি আমাদের জন্য সর্বতক সাহায্য করবেন ও তা করেছেন। আমাদের কীর্তন করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমান বাদ্যযন্ত্র ছিলো না তাই আমাদের সমস্যাগুলি মিঃ শ্রভ্রারে ও মিঃ লরেন্স ডি কস্তার বলবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেয়েছিলাম। প্রেসিডেন্ট ভিনসেন গমেজ বলেছিলেন, আমাদের একটা ঢোল দিবেন। মিঃ নবাট মেনডেন্স এসেছিলেন অতিথি হয়ে। তিনি বলেছিলেন আমাদের একটা হারমনিয়াম দিবেন। এই ভাবে সবার উৎসাহ পেয়ে আমরা কীর্তনের পথ চলা শুরু করেছিলাম। আজ এই কীর্তনদল প্রবাসী বহন করে চলেছেন। এর মধ্যে অনেক কিছু বদল হয়ে গেছে। নূতন নূতন মুখের সন্ধান পেয়েছি, বড় দল হয়েছি। কীর্তন আনারহী সকলে মিলে চলছে নূতন দিগন্তের দিকে। প্রতি বৎসর প্রভু যীশুর জন্ম বার্তা বয়ে নিয়ে চলছেন প্রবাসী। কথায় বলে দিন যায় কথা থাকে। তাই কীর্তন দলের ১২ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আমার এই লেখা। এখানে আমার লেখা দ্বারা যদি কেউ দুঃখ পেয়ে থাকেন তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এই আমার কাম্য।

- শেষান্তে নমিতা কস্তা

জিজ্ঞাসা

মেরী ডি'কস্তা- (টরোন্টো) কানাডা

আমি সম্পদ। কেন বা কিভাবে এনাম দেওয়া হয়েছে তা জানার অবকাশ হয়নি। আমার নাম সম্পদ না হয়ে কাপালিক বা কীর্তিনাশা হলেই বা কি হত? নামে কি বা আসে যায়? আমার এই ছোট্ট জীবনে আমি কখনও তো অর্থ সম্পদের মুখ দেখিনি। তবে অর্থের জন্য পিতা-মাতার মধ্যে ঝগড়া হতে দেখিছি প্রচুর। অথচ আমার এ সম্পদ নাম কোন কাজেই লাগেনি। আমার পিতা-মাতা সব সময়ই বিত্তহীন ছিলেন। আমার মাকে সবসময় কুলটা- একরোখা- চরিত্রহীনা বলে গালিগালাজ করা হয়। আমার বোধের অগম্য কেন তাকে এ অমানসিক যাতনা ও নিন্দা কুড়াতে হবে। তার তো কোন দোষ নেই। তবে তার ও আমার ন্যায্য অধিকারের জন্য মা সবসময় সমাজের বিরুদ্ধে লড়েছেন। আমার মা বাধ্য করেছিলেন আমার বাবাকে বিয়ে করতে। এ কখনও ভালবাসা বা আনন্দের বিয়ে ছিল না। আমার সরলমতী মায়ের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়েছিলেন আমার বাবা। তিনি কিছুতেই মাকে বিয়ে করতে রাজী হন নি। বরং আমার জীবন্নাশ করার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন। আমার স্নেহময়ী মা গ্রাম্য সুবিচারের মাধ্যমে বাবাকে রাজী করান তাকে বিয়ে করতে। মায়ের ভাষ্য ছিল একটাই- আমি যেন আমার বাবা মায়ের স্নেহভালবাসায় বড় হতে পারি। সুতরাং বিয়ে তাদের হয়েছিল এক অনাড়ম্বর পরিবেশে- আর তার কিছু মাস পরে ততোধিক অনাড়ম্বর পরিবেশে আমার জন্ম হয়। আমি এমনই দুর্ভাগা যে- কিছু বছরের মধ্যে আমার বাবা বিনা নোটিশেই ইহধাম ছেড়ে চলে যান। আমার মা এবার সত্যিই অসহায় হয়ে পড়লেন। তার উপর বাবার ঋণের বোঝা এস পড়ল তারই ঘাড়ে। তিনি গ্রামের অশিক্ষিত মহিলা-কোথায় পাবেন টাকা- যা দিয়ে তিনি আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় অভাব মিটাবেন ও ঋণ শোধ করবেন? তার উপর বাবার মৃত্যুর জন্য মাকেই সবাই দোষী করে চলেছে। অথচ কেউ যেন বুঝেও বুঝতে চায় না আমার বাবা একজন প্রচন্ড মদ্যপায়ী ছিলেন। সেকারণেই হয়তো তাকে অত অসময়ে চলে যেতে হয়েছে। আজ সপ্তাহখানেক ধরে মা অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়। কিভাবে বা কি করলে মা যে আমার আবার সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করবেন আমি তা জানি না। ঘরে যা খাবার ছিল তা গতকালই শেষ হয়ে গেছে। মা এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে- বিছানা ছেড়ে উঠা তো দূরে থাক- কথা বলারও তার যেন শক্তি নেই। এদিকে ক্ষুদায় আমার পেট চোঁ চোঁ করছে। ঘরের সবগুলো কৌটা- ডেক্‌চি খুঁজেও একদানা খাবার পেলাম না- যা দিয়ে আমার বা আমার মায়ের পেট পুরোতে পারব। কে আমাকে খাবার দেবে? কোথায় গেলে আমি খাবার পাব? আমার সাত বছরের ছোট্ট এ জীবনে কখনও একা কোথাও যেতে হয়নি- সর্বদাই মা আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন। দরজা খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। কত গাড়ী- বাস চলছে রাস্তায়। অসংখ্য মানুষ উর্ধশ্বাসে কেবল ছুটেই চলেছে। কারও এক মুহূর্ত সময় নেই আমার দিকে তাকিয়ে দেখার। স্কুলের পোশাক পরা অসংখ্য ছেলেমেয়ে তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে স্কুলের দিকে যেন ছুটে চলেছে। আমার মা সর্বদাই বলতেন আমি বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হব। তার স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই রয়ে গেল।হেঁটে যেতে থাকলাম সামনের দিকে। বেশ কিছুদূর হাঁটার পর কয়েকটি চায়ের দোকান নজরে এল। স্বচ্ছ কাঁচের আলমারীতে সাজানো রয়েছে নানা রঙের মিষ্টি। আর এক কর্মী দ্রুত হাতে পরোটা ভেজে চলেছে। চারিদিকে চায়ের কাপের কেবল টুংটাং আওয়াজ। কত খাবার। মনের অজান্তে হাত পেতে কিছু খাবার চাইলাম। প্রচন্ডভাবে গলাধাক্কা দিয়ে আমাকে রাস্তায় নিক্ষেপ করল কে একজন। টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম রাস্তায়। নোনতা গরম স্বাদ পেয়ে বুঝতে পারলাম ঠোঁট কেটে গেছে। হাঁটু থেকে দর দর করে রক্ত ঝরছে। লজ্জায় অপমানে কান্না ভুলে হন্ হন্ করে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হেঁটে চলেছি। এভাবে কত সম্পদ যে হারিয়ে গেছে মনুষ্য সমাজের তৈরী করা গভীর অন্ধকারে কে তার হিসেব রাখে? হয়ে গেছে তারা রাস্তার ছেলে। এমনিভাবে প্রতিদিন কত শত ঘটনা আমাদের চারিদিকে ঘটে চলেছে তার খবর রাখার প্রয়োজন মনে করি না। বা একটু সমবেদনা জানিয়েই দায় সেরে ফেলি। একবিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে উঠেও মানব শিশু ও নারীকে করে রেখেছে বঞ্চিত ও অবহেলিত। এখনও লক্ষ লক্ষ শিশু তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারা অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়হীন- স্বাস্থ্য শিক্ষার কথা তারা ভাবতেও পারে না। এখানটায় আমরা যেন মধ্যযুগে বাস করছি। নারীকে করে রাখা হয়েছে ভোগ্যপণ্য এবং সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালনের উৎস হিসেবে। নারী যেন অর্থনৈতিক মুক্ত না পায় তার জন্য ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের ভয় দেখিয়ে তাদেরকে যেমন করা হয়েছে গৃহবন্দী- অন্যদিকে তাদের ভোগের সামগ্রী হিসেবে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে পথে। কোন অবিবাহিত নারী গর্ভবতী হলে তাকে যেমনি এখনও আখ্যায়িত করা হয় কলঙ্কিত নারী হিসেবে- অন্য দিকে তার গর্ভজাত সন্তানকে বলা হয় অবাঞ্ছিত সন্তান। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা তো দূরে থাক সে সন্তান ও মাকে এ ধরায়ই পোহাতে হয় নরক যন্ত্রণা। যীশুখ্রীষ্ট মেরী ম্যাগডালিনকে দেখিয়ে জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন- "তোমাদের মধ্যে যদি কেউ নিষ্পাপ থেকে থাকে- তবে এ নারীকে প্রথম পাথর ছোঁড়" দেখা গেল একে একে সবাই পাথর ফেলে দিয়ে সে স্থান ত্যাগ করল। প্রভু যীশুখ্রীষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা সকলে আপন আপন সন্তান সন্ততি ও পরিবার নিয়ে ব্যস্ত। কে কত দামী পোশাক-জুয়েলারী কিনবো তা নিয়ে ব্যস্ত। এ সময় যেন ভুলে না যাই এ পৃথিবীতে প্রায় ১৫ লক্ষ অনাথ শিশু রয়েছে- যারা অর্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি প্রায় চার দশক ধরে। অতীতে দোষারোপ করা হয়েছে ঔপনিবেশিকতার। এখন দোষ দেব কাকে? এখন যে নিজেরাই খাদক হয়ে বসেছি। তাতে করে ধনী-গরীবের ব্যবধান কেবল বেড়েই চলেছে। যে দিন ধনী-গরীব ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি শিশু তাদের মৌলিক অধিকার তথা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান- শিক্ষা- স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা পাবে সেদিনই হবে মানবজন্ম স্বার্থক। আর এ ব্যাপারে আমাদের প্রত্যেককেই এগিয়ে আসতে হবে যার যার সাধ্যমত। আর কতদিন আমরা এদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করব? এ প্রসঙ্গে আমার একটি গল্প মনে পড়ে গেল। এক ভদ্রলোক একবার সাগর পাড়ে বেড়াতে গেলেন। সমুদ্রেতটে হেঁটে বেড়াচ্ছেন এমন সময় দেখতে পেলেন দূরে অন্য এক ভদ্রলোক নীচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করছেন। প্রথম ভদ্রলোকের ভীষণ কৌতূহল হল। তিনি এগিয়ে কাছে গিয়ে বুঝতে পারলেন ঐ ভদ্রলোক বালিতে আটকে থাকা স্টার ফিসগুলো একটা একটা করে তুলে সাগরের জলে ছুঁড়ে মারছেন। প্রথম ভদ্রলোক অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেনঃ প্রথম ভদ্রলোক ঃ আপনি স্টার ফিসগুলো সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলছেন কেন? দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ ভাঁটার টানে স্টার ফিসগুলো বালুতটে এসে আটকে গেছে-অক্সিজেনের অভাবে ওরা খুব শীঘ্রই মারা যাবে। আমি একটা একটা করে তুলে সমুদ্রে ফিরিয়ে দিয়ে ওদের জীবন বাঁচাবার চেষ্টা করছি। প্রথম ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠে বললেন ঃ এত বড় সমুদ্রতীর-ছাড়া কত সমুদ্র তীরইতো রয়েছে- সে খানে কত কোটি কোটি স্টার ফিস রয়েছে- আপনি কি এদের সবার জীবন রক্ষা করতে পারবেন?দ্বিতীয় ভদ্রলোক অতি যত্নের সঙ্গে আরেকটি স্টার ফিস ভেজা বালি থেকে তুলে সমুদ্রে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন ঃ আপাতত এর জীবন তো বাঁচাতে পারলাম।

প্রেয়সীর বড়দিন

মুকুট পি. কস্তা- হার্টফোর্ড- কানেকটিকাট

গ্রামের ছেলে প্রিয়ন্ত। টকবকে যুবক। সদ্য মেট্রিক পাশ করে বহু আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শহরে আসে। মা- বাবা- গুরুজনদের আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে সে ভর্তি হয় ভাল একটা কলেজে। পরিবারের সবার আশা প্রিয়ন্ত একদিন বড় মানুষ হবে- অনেক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। স্কুল জীবন থেকেই প্রিয়ন্ত বরাবর পড়াশুনায় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে তাই তার মেট্রিকের ফলাফল অভূতপূর্ণ। প্রিয়ন্তর সব সময়ের আশা-প্রার্থনা সে সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে- গরীব মা-বাবার দুঃখ ঘুঁচাবে। সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের কাছে সব সময় সে এই প্রার্থনা করে থাকে। কলেজ জীবনে পড়াশুনার ব্যাপারে প্রিয়ন্ত স্কুল জীবনের মতই সিরিয়াস। নিয়মিত কলেজে যাওয়া আসা- প্রতিদিনকার পড়া প্রতিদিনই শেষ করা এবং শিক্ষকের দেয়া বাড়ীর কাজ সঠিক সময়ে শেষ করা তার প্রতিদিনকার অভ্যাস। তা হবেই না কেন গরীব মা বাবার কষ্টের উপার্জনের টাকা তাকে সঠিকভাবে যে ব্যবহার করতেই হবে নইলে তো তার জীবনের উদ্দেশ্যই বৃথা হয় যাবে। তাই সে সংকল্প করেছে যত ঝড়-ঝঞ্জা আসুক না কেন সে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবেই হবে। এভাবেই সে প্রতিদিন কঠোর পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে । তার জীবনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে। কঠোর অধ্যবসায় এবং পড়া-শুনায় পারদর্শীতার ফলে প্রিয়ন্ত অতি শীঘ্রই কলেজে সবার খুব প্রিয় হয়ে উঠে। শিক্ষকরা তাকে আরও বেশী করে উৎসাহ দিতে থাকে যাতে সে সবসময় এরকম ভাল রেজাল্ট করতে পারে। শিক্ষকদের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং বন্ধুদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে প্রিয়ন্ত বেশ ভাল ভাবেই তার পড়া-শুনা চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই চলছে তার পড়াশুনার জীবন।

প্রিয়ন্তর কলেজের পাশেই প্রেয়সীদের কলেজ। প্রতিদিন তারা দু'জনে একই রাস্তা দিয়ে একই সময়ে কলেজে যাওয়া আসা করে- কিন্তু কেউ কাউকে চিনে না বা জানে না। প্রতিদিনকার যাওয়া আসার ফাঁকে ফাঁকে তারা দু'জনে দু'জনকে লক্ষ্য করে। এভাবেই চলতে থাকে প্রতিদিন। প্রেয়সীও গ্রামের মেয়ে। কথা বার্তায় চাল-চলনে অনেক স্মার্ট। আর প্রেয়সীর সুন্দরের তুলনা তো হয়না। সে যেদিক দিয়ে যায় তার স্মার্টনেস এবং সৌন্দর্যের দাপটে সব ম্লান হয়ে যায়। মা বাবার একমাত্র সন্তান প্রেয়সী। মোটামোটি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান প্রেয়সী। আর সে সুবাদে মা বাবার যত্নের শেষ নাই সন্তান প্রেয়সীর উপর। প্রেয়সী পড়াশুনায় এত ভালো না হলেও আবার খারাপও বলা যায় না। বাবা-মার আদর সৌন্দর্যের দাপট এবং পড়াশুনার অহংকার এ সব মিলিয়ে প্রেয়সীর যেমন মাটিতে আর পা পড়েনা। সবাইকে তার যেন একটু তাচ্ছিল্যের ভাব। অহংকার আর দাপটের তান্ডবে সে সবসময় ধরাকে সরা জ্ঞান করে। এভাবেই চলে প্রেয়সীর জীবন। প্রিয়ন্ত প্রথমে এগুলোকে পাত্তাই দেয়না। তার চিন্তা এ সমস্ত বাজে জিনিসের দিকে মন দিলে তার জীবনের উদ্দেশ্যই বৃথা হয়ে যাবে। সে কোন ভাবেই এগুলো চায় না। এ ভাবেই চলতে থাকে সময়। এদিকে প্রিয়ন্তর নাম ডাক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রেয়সীর কানেও একথাটা যায়। কেন জানি প্রেয়সীর ছেলেটাকে ভাল লেগে যায়। আর সে উঠে পড়ে চেষ্টা করতে থাকে প্রিয়ন্তর সাথে দেখা করার- কথা বলার। প্রতিদিনই সে কলেজে যাওয়ার সময় চেষ্টা করে প্রিয়ন্তর সাথে কথা বলার কিন্তু হয় না। একদিন তারা দু'জনে রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি চলছিল। হঠাৎ প্রেয়সীর হাতের পার্সটা রাস্তায় পড়ে যায় ঠিক প্রিয়ন্তর পায়ের কাছে। প্রিয়ন্ত দেরী না করে পার্সটা তুলে প্রেয়সীর হাতে দেয়। প্রেয়সী এই সুযোগে তার পরিচয়টা দেয় প্রিয়ন্তকে। প্রিয়ন্তও তার পরিচয় প্রেয়সীর কাছে দেয়। এভাবেই শুরু হয় তাদের পরিচয়ের পালা। তারা এখন প্রতিদিনই রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে কলেজে যায় এবং প্রতিদিনকার আলাপ আলোচনা করে। প্রতিদিনকার এভাবে আলাপচারিতার ফলে প্রিয়ন্তরও ভাল লেগে যায় মেয়েটাকে। আর একদিন তারা তাদের ভাল লাগার কথা একে অপরকে জানায়। চলতে থাকে তাদের ভালবাসার বন্ধন। তারা একে অপরকে ছাড়া কিছু চিন্তাই করতে পারে না এমন। প্রিয়ন্তর ভালবাসা পেয়ে প্রেয়সী যেন কেমন বদলে যায়। তার ভিতর এখন আর আগের মত সৌন্দর্য্যের দাপট বা অহংকার কিছুই নেই। সে যেন সত্যিই বদলে গেছে। যেন ঠিক মাটির মানুষ। প্রেয়সী এমন প্রিয়ন্ত ছাড়া কিছু বুঝে না। এত ভালবাসে সে প্রিয়ন্ত কে। দুর্ঘটনাটা যেন হঠাৎই ঘটে যায় প্রিয়ন্তর জীবনে। তার জীবন এখন মিথ্যা- চারিদিকে শুধু যেন অন্ধকার। সেদিন তারা দু'জন বরাবরের মত চুটিয়ে আড্ডা মেরে বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে বেরিয়ে এসে বাসার উদ্দেশ্যে একটি টেক্সিতে চেপে আসছিল তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। প্রিয়ন্ত বারবার ড্রাইভারকে চাপ দিচ্ছিল আরও জোরে চালানোর জন্যে। ড্রাইভার তাদের তাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় টার্ন নেয়ার সময় পিছন থেকে ট্রাক এসে তাদের টেক্সিকে ধাক্কা মারে। সাথে সাথে তাদের টেক্সি উল্টে যায় এবং তারা ছিটকে পড়ে রাস্তার ওপার। প্রিয়ন্তর নিথর দেহটা পড়ে থাকে ঠিক ফুটপাথের গাঁ ঘেঁষে। প্রেয়সী পাগলের মত খুঁজতে থাকে তার প্রিয়ন্তকে। অবশেষে খুঁজে পায় তার প্রাণপ্রিয় প্রিয়ন্তকে। প্রিয়ন্তর নিথর দেহটাকে কোলে নিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে প্রেয়সী। হায় ঈশ্বর একি তুমি রেখেছিলে প্রেয়সীর জীবনে? যে কিনা আসন্ন বড়দিন উপলক্ষ্যে প্রিয়ন্তকে তার সবচেয়ে প্রিয় পছন্দের জিনিসটা উপহার দিবে বলে গোপনে কিনে রেখেছিল প্রিয়ন্তকে "সারপ্রাইজ" দেবার জন্য। তার কপালেই ঘটে গেল চরম নিষ্ঠুর ঘটনা। হলোনা আর প্রেয়সীর জীবনে প্রিয়ন্তকে সারপ্রাইজ দেয়া। প্রিয়ন্ত যেন প্রেয়সীর জীবনে সারপ্রাইজ হয়ে রইল। পাগলিনী প্রেয়সীর হ'লনা আর প্রিয়ন্তর সাথে বড়দিন করা। নিষ্ঠুর পৃথিবীতে প্রেয়সী বেঁচে রয় প্রিয়ন্তকে সারপ্রাইজ দেবার আশা নিয়ে কবে আবার আসবে তার প্রাণপ্রিয় প্রিয়ন্ত তার কাছে??

বিশেষ ঘোষনা

আপনি বিশ্বের যে কোন প্রান্তেই বাস করুন না কেন আপনার লেখা গল্প, কবিতা, ছড়া, সমীক্ষা আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানতে পাঠিয়ে দিন। আপনার নবজাত শিশুর ছবি, কমিনিওনের ছবি - নাম, তারিখ। শিক্ষাক্ষেত্রে সন্তানের বিশেষ কৃতিত্ব। নব-দম্পতির ছবিসহ নাম, স্থান। ২৫তম/৫০তম বিবাহ বার্ষিকীর ছবি, নাম/তারিখ/স্থান আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে, আমরা তা তেপান্তরীতে ছেপে দেব।

ঠিকানাঃ
PBCA
PO Box-1568
New York, NY 10159-1568
E-mail: sgomes06@yahoo.com
sgomes99@gmail.com

ধার করা বুদ্ধির ঝাচ

ভ্যালেন্টিনা অপর্ণা গমেজ- (টরোন্টো) কানাডা

শ্রাবন্তীর মনটা আজ অনেক ভাল। এ ভাল যেন অন্য রকম। সকাল থেকে সে মনের আনন্দে হেলে দুলে একটার পর একটা কাজ করে যাচ্ছে। আজকের রাতটা পার হলেই সকালের সূর্যের কোমলতায় মনের যত কথার মালা সাজিয়ে সে রওনা দেবে পাবনকে আনতে। তিন বছর পর পাবন দেশে আসছে জাপান থেকে। বিয়ের পর মাত্র ২৫ দিনের স্মৃতিকে হৃদয়ের গভীরে লালন করে শ্রাবন্তী দিন কাটাচ্ছে। প্রতীক্ষার প্রহর গুলো কত স্বপ্নের রং তুলিতে মেখে একটি একটি করে আল্পনা এঁকেছে। আজ তার প্রতীক্ষার সমাপ্তি হবে। শ্রাবন্তী মনে মনে অনেক কথা পাবনকে বলবে বলে জমিয়ে রেখেছে। তার ধারণা পাবনও হয়তো ঠিক তার মতই আকূল হয়ে আছে। এয়ারপোর্টে পৌঁছে শ্রাবন্তীর চোখগুলো সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ততায় খুঁজছে কোথায় তার সেই প্রতীক্ষার মানুষটি। শ্রাবন্তীর সাথে এসছে তার দেবর কলোল- সে মাঝে মাঝে বৌদিকে তাক লাগাতে দুষ্টুমী করে বলছে- বৌদি ঐ যে দেখ পাবনদা- দেখছনা ঐ যে ভুড়িওয়ালা! শ্রাবন্তীর ভালই লাগছে- তাই দেবরের দুষ্টুমীতে হি-হি করে হাসছে। অনেক প্যাসেঞ্জারের ভিড়ে এক সময় পাবনকে দেখা গেল কিন্তু কেউ-ই তাকে প্রথম দর্শণে চিনতেই পারলনা। শ্রাবন্তীর অস্থির দৃষ্টি যখন এদিক ওদিক উঁকি দিচ্ছে ঠিক তখন সামনে এসে দাঁড়াল একটা ঝুঁটিওয়ালা-দাঁড়িওয়ালা একজন লোক। চোখের চশমাটা খুলতেই কলোল দাদা বলে গলায় জড়িয়ে ধরল। শ্রাবন্তী দু'হাত মুখে চেপে অবাক দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। এই কি তার সেই পাবন? এতটা চেঞ্জ? কলোল বৌদির চোখের সামনে হাততালি দিয়ে বলল- কি হল বৌদি দাদাকে দেখে বোবা হয়ে গেলে নাকি- কিছু একটা বল। শ্রাবন্তীর অবাক চোখের আড়ালে সব কথা হারিয়ে গেল। তাই মাথা নীচু করে লজ্জার হাসি ছাড়া অন্যরকম কিছু হলনা। পাবন যখন দেখল শ্রাবন্তী লজ্জা পাচ্ছে তখন সে তার হাত ধরল। কি হল ফোনে যে ময়না পাখিটা এত কথা বলত আজ তার মুখে খিল লাগল যে। চলো গাড়িতে বসেই শুনব। পাবন শ্রাবন্তীর হাত ধরেই রাখল। কলোল লাগেজগুলো সব গাড়িতে তুলল। বাইরের এত লোকজনের ভীড় দেখে পাবন কেমন যেন বিরক্তির স্বরে বলল এ দেশে কোন পরিবর্তন নেই। যা দেখে গেছি তিন বছর আগে এখনো সেই রকমই আছে। যে দিকে তাকাই মানুষ আর মানুষ। নিয়ম-শৃঙ্খলার কন্ট্রোল নাই তেমনি মানুষ জন্মেরও কন্ট্রোল নাই- কি হবে এ দেশের ভবিষ্যত? বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল পাবন। শ্রাবন্তী মনে মনে ভাবছে সব কিছু ছেড়ে পাবনের দেশ নিয়ে এত মাথা ব্যাথা কেন? কলোল মোবাইলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বন্ধুর সাথে গ্যাজাচ্ছে কোন দরকারী কথা নয় এমনি। পাবন এদিক সেদিক তাকিয়ে অবাক হচ্ছে সবার হাতে মোবাইল। রিক্সাওয়ালা- সব্জিওয়ালা এমনকি মাঝির হাতে পর্যন্ত। -কিরে কলোল একি অবস্থা! ছেলে বুড়ো সবার হাতেই মোবাইল! -হ্যা দাদা- কিছুক্ষণ আগে তো বলেছিলে এ দেশের কোন পরিবর্তন নেই। এখন কি পরিবর্তন চোখে পড়েছে? -wow দারুণ ব্যাপার তো। আসলেই স্ট্রেঞ্জ। ভাল-ভাল। -জান দাদা- আমাদের বাড়িতে শীতলের মা কাজ করে তার হাতেও ফোন আছে। -বলিসকি! তাহলে তো আমরা আর গরীব নই তাইনা। -তা অবশ্য বলা যাবে না অনেক কিছুর উন্নতি হলেও বেকারত্ব কমেনি। এদেশের শিক্ষিত বেকারদের খুবই দুরাবস্থা। বড় বড় মার্কেট হচ্ছে অফিস হচ্ছে কিন্তু কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে না। ঘরে ঘরে রাজনীতি।

-ওরে বাবা রাজনীতির কথা তুলিসনা। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। পাবন লক্ষ্য করছে এতটা পথ আসার পরও শ্রাবন্তী কিছুই বলছে না। কলোলের কানে কানে আস্তে আস্তে জানতে চাইল পাবন- -কিরে ভাই তোর বৌদি যে কথা বলছে না বাড়িতে মার সাথে কোন টক্কর-মক্কর লেগেছিল নাকি। শুধু মিটি! মিটি! হাসছে। -কলোল বৌদির কানে ফিশ ফিশ করে জানতে চাইল। -বৌদিগো ভাই অস্থির হচ্ছে। গাড়িতে উঠার আগে কত কিছু শুনলাম তোর দাদা এলে এই বলব ঐ বলব। পাবন শ্রাবন্তীকে কথা বলানোর জন্য একটু ভাল বল্‌লো। মাথা নীচু করে কপালটা ধরল। আর ওমনি শ্রাবন্তী উত্তেজিত স্বরে পাবনের ঘাড়ের কাছে আসল -এ্যাই কি হল তোমার? তোমার কি খারাপ লাগছে? কলোল প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও পাবনের চোখের ইশারায় বুঝে নিল। শ্রাবন্তী কলোলকে পানির বোতল দিতে বলল। পাবন মাথাটা শ্রাবন্তীর কোলে হেলিয়ে দিল। শ্রাবন্তী অস্থির হয়ে চোখে জল ছিটিয়ে তারপর মুখেও দিল। জলটুকু পান করে চোখ বন্ধ করে রইল পাবন। -ওগো কি হল তোমার? বলনা তোমার কি খারাপ লাগছে। এ্যাই শুনছ? পাবন যখন দেখল শ্রাবন্তী বেশ অস্থির হয়ে গেছে তখন ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল। -হ্যা বল শুনছি। তোমার কথা শোনার জন্যই তো আমি অপেক্ষা করছি। -হুম দুষ্টুমী তাইনা। কেমন ঘাবড়ে দিয়েছিলে। আচ্ছা বাড়ি চলো কত কথা শুনতে চাও শোনাব- পরে তো কানে তুলো দেবে। শ্রাবন্তীর মত আমাদের গ্রাম-বাংলার মেয়েরা স্বাভাবিক ভাবেই এরকম লাজুক হয়। স্বামীর প্রতি অগাধ ভালবাসার প্রতীক হিসেবে হৃদয়ের সব কথা যেন তার চোখের গভীরেই হারিয়ে যায়। অনেক কিছু বলতে চেয়েও ব্যক্ত করার ভাষা হারিয়ে যায়। শুধু নীরবতাটুকু থেকে যায় লজ্জার ভূষণ হিসেবে। শ্রাবন্তীর মাথার বড় বড় চুল পাবনের খুব ভাল লাগে। বাতাসের তোড়ে চুলগুলো মাঝে মাঝেই শ্রাবন্তীর কপালে এসে পড়েছে পাবন খুব যত্ন করে তা সরিয়ে দিচ্ছে। কলোল দেখে একটু লজ্জা পেলেও- আড়চোখে সে তাকিয়ে দেখছেও। কলোলের পছন্দের মানুষটি যদি তার পাশে থাকত মনে মনে ভীষণ লোভ হচ্ছে তার। যেই ভাবা সেই কাজ। কাছে না পেলেও অন্তত মোবাইলে দু'চারটে প্রেমালাপ হলে মন্দ কি। শ্রাবন্তী বুঝে ফেলল- পাবনকে সে ইঙ্গিতে দেখাল কলোল এখন কার সাথে কথা বলছে। কিছুক্ষণ পরই গাড়ি থামল ঠিক বাড়ীর সামনে। পাবন চোখ মেলে তাকাল- আসলেই কত পরিবর্তন গ্রামেও। রাস্তাঘাটগুলো কত চওড়া- পিচ ঢালাই করা পথে চলতে কতই না আরাম। শহর থেকে গ্রামে আসতে সময়টাও কত কম লাগে এখন। -জানিস কলোল সেই যে ছোট বেলায় আই মিন ১২-১৩ বছর আগের কথা তোর মনে আছে? আমরা ঢাকায় যেতাম লঞ্চে করে। ৪/৫ ঘন্টা লঞ্চে বসে থাকতে থাকতে শরীরে ঝিম লেগে যেত। আজ কোথায় গেল সেই দিন। কল্পনাই করা যায় না কত পরিবর্তন। -দাদা তোমার তাহলে সে সব দিনের কথাও মনে পড়ে। আমি তো ভেবেছি অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে তোমার বিরক্তিই লাগবে। -কি যে বলিস। শৈশবের স্মৃতি কেউ কোনদিন ভোলে নাকি। অবশ্য সে সব দিনের আনন্দটাই ছিল আলাদা তা আজকাল খুঁজে পাওয়া যায় না। কলোল আর পাবন কথা বলতে বলতে বাড়ীর উঠান পর্যন্ত আসতেই পাবনের মা ছুটে এলেন। কতদিন পর ছেলেকে দেখছেন। কাছে আসতেই চশমাটা খুলে আবার চোখে দিলেন। -ও কিরে বাবা তোর এই বেশ কেন? মাথায় ঝুটি বেঁধেছিস- গোফ রেখেছিস যে। শ্রাবন্তী তোকে চিনতে পেরেছে? এই যে কলোলের বাপ দেখ দেখ তোমার মেঝোছেলের কি চেহারা। পাবনের বাবাও ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। তিনি অবশ্য অবাক হননি কারণ তিনি ও যখন বিদেশে কাজ করতেন তখন এমনটি তিনিও করতেন। পাবন মা-বাবার পায়ের ধূলো মাথায় নিল। বাবা খুশীতে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কলোল ফিশ্ ফিশ্ করে বৌদির কানের কাছে গিয়ে বলল- -বৌদি দেখ বড় ছেলের আদর- সরাসরি বুকের ভেতর ENTER। কথাটা পাবন শুনে ফেলেছে। সেও হেসে হেসে উত্তর দিল -বিদেশ করে এলে তুইও পাবি। হিংসা করিসনারে। মালামাল ঘরে তুলেই পাবন বড় বৌদির কথা জানতে চাইল। পাবনের বড়দা তমাল। বিয়ে করেছে দশ বছর হতে চলল।

কিন্তু তাদের এখনো কোন সন্তানাদি হয়নি তাই তাদের দাম্পত্য জীবনে বেশ বিষন্নতা। -তোর বৌদি দু'সপ্তাহের জন্য বাপের বাড়ি নায়ড় করতে গেছে। তাছাড়া তার ছোট বোনের বাচ্চা হবে তাই গেছে। -বাচ্চা হবে কার নীলার? বল কি ওর বয়স কত? সেই দিন দেখলাম ফ্রক পরে ঘুরছে। প াবনের কথা শুনে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে শ্রাবন্তী। -হেসোনা হেসোনা। নীলা কতটুকু মেয়ে? তোমার চেয়ে ও বোধ হয় ছোট হবে। বিয়ে হয়েছে আবার তার বাচ্চাও হবে। প াবনের মা মুখটা বাকিয়ে বলল- -প্রেম করেছে বিয়ে দেবেনা কি করবে। আজকালকার মেয়েরা ছোট্টকালেই পেকে যায়। এখন আর ছেলের বাপ-মাদের মেয়ের খোঁজে বের হতে হয়না- ছেলে বৌ এমনি ঘরে আসে। কি যে দিনকাল পরল। কথাটা বলেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। প াবন আড়চোখে শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে মুচকী হাসল। বুঝতে বাকি রইলনা যে মায়ের কথার স্বর কি মিন করছে। প াবন আর আগে বাড়লনা। সোজা চলে গেল নিজের রুমে। স ান সেরে একটু বিশ্রাম নিল। রাতে খাবার টেবিলে বসে সবার কুশলাদি জিজ্ঞাস করল। আর সেই সাথে শ্রাবন্তীকে নেবার কথাটাও তুলল। শ্রাবন্তী তো অবাক। প াবন তাকেও কথাটি বলেনি। কলে াল হা করে তাকিয়ে রইল। আর প াবনের মার মুখে যেন খিল পরল। তিনি হা-না ভাল মন্দ কিছুই বললেন না। তবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তিনি একেবারেই খুশী নন। তারপর দিন সকালে শ্রাবন্তীকে নিয়ে শশুর বাড়ি দেখা করতে যাবে ঠিক অমন সময় মা প াবনকে ডাকল। -কোথাও যাচ্ছিস বাবা? -হ্যাঁ মা শশুর বাড়ি যাচ্ছি দেখা করতে। -কাল এলি- এত তাঁড়াহুড়া কিসের ? তা তোর হাতে ব্যাগে অতকিছু কি নিচ্ছিস? -দেখমা তুমি তো জান আমার দুটো শালা-শালী আছে- ওদের জন্য কিছু টুকটাক আরকি। মার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। অবশেষে তিনি যে কি কারণে প াবনকে ডেকেছেন সে কথাটাই ভুলে গেলেন। প াবন বুঝতে পারছে শ্রাবন্ত ী খুব একটা সুখী নয় এই পরিবেশে যদিও সে এ বিষয়ে আজ অবধি কোন কথা তাকে বলেনি। শ্রাবন্তী খুব খুশী বাপের বাড়ি যাচ্ছে এবং প াবনের সাথে যাচ্ছে। শ্রাবন্তীর মা-বাবা ও হয়ত অধীর হয়ে অপেক্ষা করছেন। স্বাভাবিকভাবেই ছেলে বিদেশ থেকে ফিরলে যেমন মায়ের মন অফুরন্ত খুশীতে ভরে উঠে তেমনি মেয়ের খুশীর জন্য মেয়ে জামাই বিদেশ থেকে আসে শশুর-শাশুরী ও ভীষণ খুশী হয়। হয়তবা কোন কোন ক্ষেত্রে প াবনের মার মত মায়েরা এত নারাজ হয়। তাদের ধারণা ছেলে একান্তই তার- শশুর বাড়ি গেলেই বুঝি ছেলে আমার বদলে যাবে। তাই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ছেলে যখন বিয়ে করে তখন অনেক মা-ই ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আর মনে মনে ভাবে "এই বুঝি ছেলে আমার পর হয়ে গেল"। বাস্তবে অনেকেই এই ধারণার জের ধরে পুত্রবধূকে কখনোই আপন ভাবতে সাহস পায়না সব সময় পরের ঘরের মেয়ে বলেই মনে করে। প াবন শ্রাবন্তীকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি থেকে ঘুরে আসার পর- শ্রাবন্তীকে কাছে ডাকল। পাশে বসাল। তারপর কিছু প্রশ্ন করল। -বিয়ের পর আমি তিনবছর পরে বড়ি এলাম। এসে অনেক কিছুর পরিবর্তন দেখলাম বিশেষ ভাবে আমার মার আচরণে। এই তিনবছরে তুমি অনেক চিঠি লিখেছ আমাকে তবে কখনো সাংসারিক বিষয়ে কিছু লেখনি। তুমি সত্যি করে বলতো তুমি কি আমাদের সংসারে সত্যিকার অর্থেই সুখী? শ্রাবন্তী কখনো ভাবেনি প াবন তাকে এভাবে প্রশ্ন করবে। উত্তরটা সে কিভাবে দেবে ঠিক যেন গোছাতে পারছিলনা। একটু আমতা আমতা করছিল। -দেখ শ্রাবন্তী আমি ফ্রিলি তোমাকে প্রশ্ন করলাম- জবাবটাও তুমি ফ্রি মনে দেবে। তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমার স্বামী। শ্রাবন্তী কথাগুলো কোনদিন হয়ত প াবনকে বলতো কিন্তু এই মুহূর্তে কোন কথাটা আগে বলবে সে ভেবে পাচ্ছিলনা। প াবন তাকে সহজ করার আপ্রাণ চেষ্টা করল। তার কথাগুলো জানা দরকার। শ্রাবন্তী ধীর পায়ে দরজাটা বন্ধ করল কারণ সে জানে শ্বশুরীর দৃষ্টি সারাক্ষণ তাদের দিকে। কান পেতে কথা শোনার অভ্যাসটি নতুন নয়। তাই খুব সংক্ষেপে সে প াবনকে বোঝাল- -আমি তিন বছরের সবকিছু তোমাকে জানাতে চাইনা শুধু বর্তমানে একটা ঘটনা তোমাকে বলছি। তোমার বড় বৌদির বাচ্চা হচ্ছেনা বলে এমনিতেই সবার মন খারাপ- বেচারী অনেক গঞ্জনা সহ্য করছে। তুমি দূরে থাক এসব তোমাকে জানাইনি কারণ অযথা দুঃচিন্তা করবে। তোমার দাদা বৌদি ডাক্তার দেখাচ্ছে- অনেক চেষ্টাই করছে। গত মাসে যখন তুমি বাড়ি আসবে জানলাম- তোমার মাকেও বললাম। প াবন হঠাৎ শ্রাবন্তীকে থামাল -তোমার মাকে নয় বল মাকে- আমার মা তো তোমারও মা। শ্রাবন্তী হাসল। মা বলে সে ডাকলেও শাশুরীর ব্যবহারে মাঝে মাঝে মন থেকে ডাকটা বের হয়না তবুও সে প াবনের কথায় ভুল স্বীকার করে নিল। -মাকে বললাম তুমি ছুটিতে বাড়ি আসছ। সে আমাকে কি বলল জান? -কি বলল মা? -বলল- "দেখ শ্রাবন্তী প াবন এলে এবার বাচ্চা-কাচ্চার কথা মুখে এনোনা। যে পর্যন্ত তোমার বড় জায়ের বাচ্চা-কাচ্চা না হয় সে পর্যন্ত তোমরাও বাচ্চা নিওনা। প াবনকে বুঝিয়ে বলো। প াবন কথাটা শুনে চুপ করে রইল। তার ধারণা ছিল বৃদ্ধা বয়সে নাতী-নাতনী দেখার স্বপ্ন দাদা-দাদীর একমাত্র স্বপ্ন অথচ তার মা এমন কথাটা বলেছে। -আমি জানি বড় বৌদির বাচ্চা হচ্ছেনা- ভবিষ্যতে হবে। তাই বলে আমরা বাচ্চা নেবোনা এমন সিমপ্যাথী তো ঠিকনা। বরং আমাদের ঘরে বাচ্চা হলে দাদা-বৌদির খুশী হবার কথা। -শোন বড়দি সব সময়ই আমাকে বলে- "প াবন এলে তোরা দেরী করিসনা। বাচ্চা নিয়ে ফেলিস। "তারা তো অবশ্যই খুশী হবে কিন্তু মা তো ব্যাপারটিকে অন্যভাবে দেখছেন। -আমি এ ব্যাপারে মার সাথে কথা বলতে চাইনা। আর আমি তোমাকে এবার নিয়ে যাব এটাই ফাইনাল। -মার মতামত নেবেনা? -তাকে তো ইতিমধ্যে জানিয়েছি তবে বাঁধা তিনি দিতে পারবেন না। প াবন চুপচাপ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ভাবল তার মার মনোভাব এতটা পরিবর্তন কি করে হল। সে তো খুব খোলা মনের মনুষ ছিল হঠাৎ তার মনে হল কলে ালের সাথে আলাপ করলে বিষয়টা পরিস্কার হবে। -শ্রাবন্তী তুমি দেখতো কলে াল ঘরে আছে কিনা- ওকে বলো আমি ডেকেছি। শ্রাবন্তী কলে ালের রুমে যেতেই বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছিল মোবাইলে কার সাথে যেন বেশ রসালাপে ব্যস্ত। দরজায় নক করে ঢুকল। -এই যে ছোট ভাই আমার কর্তা তোমাকে ডেকেছে। এক্ষুণি যাও নইলে খবর আছে। মোবাইলের রসের মানুষটিকে বায় বলে ওমনি ছুটল দাদার কাছে। -দাদা আমাকে ডেকেছ? -হ্যারে ভাই- তোর সাথে একটু আলাপ আছে। তোর অন্য কোন কাজ নেই তো? -আরে না দাদা। এখন তো বেকার- মোবাইলে গাল-গল্প মারি। -তুই কি একটা বিষয় লক্ষ্য করেছিস- মার কথাবার্তায় দিন দিন কেমন যেন রসকস নেই। মা তো এমন ছিলনা। তোর কি মনে হয়? -এর উত্তর হচ্ছে হেমনের মা। ঐ মহিলার আগমন থেকেই মার এই পরিবর্তন। -এ আবার কে? -দাদা এই হেমনের মা মহিলাটি বেশ ডেঞ্জারাস। তার সংসারে কিছু উল্টো পাল্টা হচ্ছে ছেলে-ছেলে বৌদের নিয়ে। নিজে তো স্বতি-সাবেত্রী কোন দোষ নেই তার- যত দোষ ঐ ছেলে আর ছেলে বৌয়ের। শুধু ভাল তার মেয়ে -আর জামাই। যত কাহিনী মার কাছে এসে ঢালে। আর মাকেও বুদ্ধি দেয়। এই তো তুমি আধঘন্টা অপেক্ষা কর এই এলো বলে। -ঠিক আছে আসুক তাহলে- আজকে হবে শিক্ষা- প াবনকে চেনোনা। শ্রাবন্তী বার বার তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে এমনটি যেন না করে। এতে বদনামটা উল্টো শ্রাবন্তীর ঘাড়েই পরবে। শ্রাবন্তী অনুরোধ করল- -তুমি যা করতে চাইছ- সেটা ভাল হবেনা। বরং বদনামটাই হবে। শুধু শুধু তোমার মন-মেজাজ নষ্ট হবে- কষ্টও হবে। কলে াল বহুবার চেষ্টা করেছে কিন্তু মা উল্টোই বোঝেনা তুমি জান? ঐ হেমনের মা না এলে মা কেমন ছটফট্ করেন। সন্ধ্যে হলেই তার জন্য অপেক্ষায় বসে থাকেন। বাবা ও এ নিয়ে কতবার মার সাথে কথা কাটাকাটি করেছেন। তোমরা যেমন মদ-বিড়ি খাও- প্রতিদিন না খেলে ভাল লাগেনা ঠিক তেমনি- মাও হেমনের মার সাথে বসে একখিলি পান না খেলে আর পেটের কথা না ঢাললে অস্থির হয়ে যান। বলতে পার এ এক ধরণের নেশা। এই নেশায় আসক্ত আমাদের সমাজের অনেক শ্বাশুরীরা। তাই আমাদের মাঝে এত সমস্যা।

প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন আয়োজিত দু'দিনের সম্মেলনে প্রাণের স্পন্দন।

প্রতিদিনের হাজারো মানুষের মুখরিত কলতালে- অপূর্ব নৃত্যের দোলে- সুর ও ছন্দের মূর্ছনায়- আনন্দের অমৃতধারায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

সুবীর এল রোজারিও(প্রতিবেদক)

সম্মেলনের ঠিক দু'চারদিন পূর্বে নিউইয়র্কের আবহাওয়া খুব উত্তপ্ত ছিল। মেঘবিহিন চোখ ধাঁধানো প্রখর রৌদ্রতাপিত আকাশ। চারিদিকে অগ্নিধারার উত্তাপ। নিথর নিশ্চল গাছপালা পত্রপল্লব। কিন্তু সে কি আশ্চর্য। সম্মেলনের দু'দিন (১৪ই ও ১৫ই জুলাই) প্রকৃতি হঠাৎ বদলে গেল। কি হলো গো? সকলের প্রশ্ন। প্রখর উত্তাপ নেই। নেই কোন বর্ষণ। নীল আকাশের গা বেয়ে দেখা যায়নি কোন মেঘোমালা কিংবা তারই ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়নি কোন ক্লান্ত চিল ডানা মেলে উড়তে।

সম্মেলনের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে নগরের কর্মকোলাহল ও গতানুগতিক যান্ত্রিক জীবন প্রবাহ থেকে খানিকটা বৈচিত্রময় পরিবেশ। চারিদিকে সবুজ বনানী-যেন পাখীডাকা- ছায়াঢাকা পরিবেশ। তারই মাঝে সম্মেলন কেন্দ্র অবস্থিত।

১৪ই জুলাই দেখতে দেখতে ঘড়ির কাটায় বেজে উঠে সকাল সাড়ে দশটা। লোকজন তখনও এসে পৌছায়নি। আমি সম্মেলনের প্রধান ফটকে প্রবেশ করে দেখতে পাই দু'সারিতে উপবিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকার দল। তারা নিবন্ধনের কাজে নিয়োজিত। আরও দেখতে পাই নিরাপত্তাকর্মী- তারা সতর্ক দায়িত্ব পালনরত। এ সময় আমার চোখে পড়ে এক বিরল দৃশ্য। দেখতে পাই নানা ষ্টেট থেকে আগত অতিথিবৃন্দের সকলেই সম্প্রীতির কুশলাদি বিনিময় করার মধ্যে রচনা করে চলেছে এক নূতন ভ্রাতৃত্বের ও ঐক্যের সেতুবন্ধন। সে দৃশ্য হৃদয়ে আজও গেঁথে আছে। মনে হয়েছে দু'দিনের সমাবেশের স্বার্থকতা যেন এখানেই লুকায়িত রয়েছে।একটু সামনে পা বাড়াতেই চোখে পড়ে এ প্রবাসের কিছু ক্ষুদে ব্যাবসায়ীদের। কেউবা শাড়ী-কাপড়- চুড়ি- নূপুর-ঝুমুর মেলে বসেছে। কেউবা ধর্মীয় পুস্তকাদি বিনামূল্যে সরবরাহ করছে। কেউ বা বিক্রি করছে সুন্দর ও সুদৃশ্য ছবি ও ছবির ফ্রেম। তাদের কারো কারো ব্যবসায়ে রমরমা ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

সম্মেলনের হলে প্রবেশ করতেই দৃষ্টি পড়ে সুসজ্জিত আলো–ছায়া ঘেরা এক সাংস্কৃতিক মঞ্চ- পল্লীকবি জসিমউদ্দিনের সেই হৃদয়ের নকশীকাঁথা- যে নকশীকাঁথাকে ঘিরে তিনি রচনা করেছিলেন বিখ্যাত অমরকাব্য। সেই নকশীকাঁথা দিয়ে সাংস্কৃতিক মঞ্চের পটভূমি রচনা করা হয়েছে। তাছাড়া- মঞ্চের গায়ে গায়ে ব্যানার-ফ্যাস্টুন- তবলা- হারমোনিয়াম ও তানপুরার ছবি এঁকে সুসজ্জিত করা হয়েছে সাংস্কৃতি মঞ্চ। এ সুজ্জিতকরণ উপকরণ সামগ্রী বাংলা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। মোটকথা- একটি মনোলোভা পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস যা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ আকর্ষণে আবেগতারিত করে তুলবে।

সম্মেলনের প্রথমদিন ১৪ই জুলাই-২০০৮। পবিত্র বাইবেল পাঠের মাধ্যমে সম্মেলনের প্রথম দিনের সূচনা করা হয়। প্রথমে আমেরিকার জাতীয় সংগীত ও ঠিক তার পরপর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গেয়ে সম্মেলনের প্রথম দিনের যাত্রা শুরু করা হয়। সম্মেলনের প্রধান সমন্বয়কারী মিঃ সাইমন গমেজ শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর নৃত্যের তালে তালে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে নর্থ ক্যারোলিনার দল। মেরীল্যান্ডের পক্ষ থেকে "ধন ধান্যে পুষ্পেভরা" গান ও গানের সঙ্গে নৃত্য নিয়ে এলো সুমা ও আশা। এবারে লালফিতা কেটে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার ষ্টেনলী গমেজ। তিনি বিশেষ বক্তব্য প্রদান করেন। তার বক্তোব্যে সম্মেলন যেন ফিরে পায় দিক নির্দেশনা। তিনি বলেন "আমরা অনেকেই বলি আমেরিকা বিদেশ- পরদেশ কিংবা বিভূঁই। কিন্তু আমেরিকা হলো আমাদের স্বদেশভূমি। প্রিয় মাতৃভূমির ন্যায়। আমরা তো এখানেই বাস করছি। প্রতিদিন অসংখ্যজন এদেশের নাগরিকত্ব অর্জন করছে। সকল জাতির সংস্কৃতি ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণ। প্রত্যেকেরই উচিত ভাল সংস্কৃতি অনুসরণ করা ও মন্দ বর্জন করা। কেহ যদি শুধু বাংলাদেশের সংস্কৃতি অনুসরণ করে ও আমেরিকার সংস্কৃতি বর্জন করে তাহলে উহা সঠিক

সিদ্ধান্ত নয়। আবার কেহ যদি আমেরিকার সংস্কৃতি অনুসরণ করে আর বাংলাদেশের সংস্কৃতি বর্জন করে তবে উহাও সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। আমাদের উচিত এ দু'য়ের সমন্বয় সাধন বা ভারসাম্য রক্ষা করা। ছোট ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন- "Don't be ashmed of your culture- maintain a balance between Bangladeshi and American Culture. Today's gathering is for you."
এসময়ে মঞ্চে আসে মেরীল্যান্ড। তাদের মঞ্চায়িত 'কনজুস' নাটিকাটি দীর্ঘায়িত হওয়ায় অনেক দর্শক অভিনয় উপভোগে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তবে 'ঢাকার রাজপথের জীবন' অনুষ্ঠানটি ছিল বেশ মনোজ্ঞ। দর্শক কর্তৃক সর্বাধিক প্রশংসিত হয়। এখানে শহরের টোকাই- সবজিওয়ালা- ফেরিওয়ালা- ছাত্র- মাতাল- ঝাড়ুদারের জীবনযাত্রা তুলে ধরা হয়েছে। এই উন্নত ও আধুনিক পৃথিবীতে বাস করে বাংলাদেশের জীবনযাত্রার কথা ভাবা খুবই কঠিন। ওরা তো মানুষ- কবে ওদের জীবনের উন্নতি হবে। ঢাকা শহরের অপ্রতুল ও অপ্রশস্থ রাস্তাঘাট- ক্রমবর্ধমান বেকারসমস্যা- চুরি-ডাকাতি- ছিনতাই নিত্যদিনের এই বিষয়গুলো দর্শকও শ্রোতাদের ভাবিয়ে তুলে।

সন্ধ্যায় লজ্জাশীল তারকাগুলো যখন লজ্জাবনত মুখে আকাশের কোলে সবে জেগে উঠেছে- সমস্ত গগন নীল ঠিক এমনি এক মধুময়ক্ষণে সিলভার পাড়ের কালো শাড়ী- মাঝখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোনালী বুটিক- ম্যাচিং করে ব্লাউস পরিহিতা শান্ত-স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী- বাংলার সুকণ্ঠী কনক চাপা এলেন দর্শকের মাঝে। হর্ষধ্বনি ও করতালি দিয়ে দর্শক তাকে অভিনন্দন জানায়। প্রথম কণ্ঠেই তিনি গেয়ে উঠেন "একবার যেতে দেনা আমার ছোট্ট সোনার গায়ে"। বিরতীহীনভাবে তিনি প্রায় কুড়িটি গান পরিবেশন করেন। প্রখ্যাত শিল্পী কনক চাপার যাদুকরী সুরের ছন্দে মুহূর্তে হারিয়ে যায় শ্রোতা। তার সংগীত পরিবেশনায় দর্শক-শ্রোতারা ছিল মন্ত্র-মুগ্ধ।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন। ১৫ই জুলাই। রবিবার। দুপুর বারটায় পবিত্র মীসা। এই মীসা দিয়ে শুরু হবে দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচী। ঘড়ির কাটায় ১টা বেজে গেছে। লোকজন দ্রুত ছুটে আসছে। কেহ দ্রুত গাড়ী পার্ক করছে। ভরা দুপুর। ঝলমলে আলো। যেন ঘুঘু ডাকা দুপুর। চারিদিক নির্জন। দূর থেকে যেন কানে ভেসে আসছে ক্লান্ত ঘুঘুর পিপাসাকাতর সুর।

ফাদার ষ্টেনলী গমেজ উৎসর্গ করেন নৈবেদ্য। নৈবেদ্য শেষে ছিল মধ্যাহ্নভোজের বিরতী। উভয় দিনেই নৈশ ও মধ্যাহ্নভোজের সুব্যবস্থা ছিল। দীর্ঘ লাইনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলার সাথে সকলে খাবার গ্রহণ করে।

মধ্যাহ্ন বিরতির পর মঞ্চে আসে রিয়া মজুমদার। বাবা মায়ের হাত ধরে সুদূর টরেনটো থেকে এসেছে ছোট্টমনি রিয়া মজুমদার। রিয়াকে হারমোনিয়াম ও তবলায় সহযোগিতা করেছে তার বাবা ও মা রনি মজুমদার ও রিক্তা মজুমদার। অতঃপর মঞ্চে এলো দুই গোলাপী সিলভিয়া ও শিউলী। তারা আধুনিক গানের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে।

বাংলায় একটি কথা বা বাক্য বলতে যার এত সমস্যা অথচ বাংলা নাচ-গান-বাদ্যের প্রতি তার কি মোহ! ভাবতে অবাক লাগে। কানেকটিকাটের এক তরুণ একক তবল বাজিয়ে সকলকে অবাক করেছে। বাংলা সংস্কৃতি আয়ত্বের এক বিরল দৃষ্টান্ত।

"তোমার হলো শুরু- আমার হলো সাড়া" নিউইয়র্কের পক্ষে মঞ্চে নিয়ে এলো রবীন্দ্র সংগীত লিপি রোজারিও। অতঃপর জীবনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সম্মেলনের মঞ্চে গান গেয়ে গেলেন আর্নেষ্ট ডি কস্তা। তিনি গেয়েছেন জগন্ময়মিত্রের "ভুলে যাও মোরে"। জীবনে ও যৌবনে সংগীত ছিল তার পেশা ও নেশা- সাথী ও সাধনা। তাই এই বয়সেও তিনি তা ত্যাগ করতে পারেননি। বয়সের ভারে ন্যুয়ে পড়েছেন। শারীরিক অবস্থা তেমন ভাল নয়। কিন্তু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। ছুটে এসেছেন সম্মেলনে ভক্তদের শেষ গান শোনাতে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের নৈশভোজের পর ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী অনুপ ঘোষাল সংগীত পরিবেশন করেন। স্বদেশী সাংস্কৃতিক সাজে সজ্জিত ও পাঞ্জাবী পরিহিত নির্মল গমেজের ঢোলের তালে তালে ও স্ত্রী রেনু গমেজের ধূপ হাতে পূঁজোর নৃত্যের তালে তালে শিল্পীকে মঞ্চে নিয়ে আসা হয়। শিল্পী একে একে অনেকগুলো গান পরিবেশন করেন।

তখন রাত্র প্রায় ১০টা। দু'দিনের অনুষ্ঠান পরিসমাপ্তির পথে- প্রধান সমন্বয়কারী মিঃ সাইমন গমেজ মঞ্চে এলেন। দু'দিনের অনুষ্ঠানে সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এসময়ে মঞ্চে এলেন মিঃ ক্লেমেন্ট গমেজ (বাদল)। তিনি র‍্যাফল ড্র পরিচালনা করেন। দর্শকের মধ্যে আবার ফিরে আসে আনন্দের উচ্ছ্বাস ও প্রাণচঞ্চল্য। র‍্যাফল ড্র-এর পুরস্কার বিতরনের মধ্য দিয়ে ভাংলো দু'দিনের মিলন মেলা।

উপসংহারে বলা যায়- দু'দিনের এই অনুষ্ঠান ছিল মূলতঃ
বাংলা ভাষা- ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক মহোৎসব। এ উৎসব সুন্দর ও সফল হয়েছে। প্রতিদিন সহস্রাধিক লোকের সমাবেশ ঘটেছে। উত্তর আমেরিকার বাইরে থেকেও যেমন থাইল্যান্ড ও কানাডা থেকে অনেক অতিথি এসেছে। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা এক ঝাঁক শিশুর নাচ-গান পরিবেশন ছিল হৃদয়স্পর্শী ও উপভোগ্য। দু'দিনের আনন্দের অমৃত ধারায় মানুষ হারিয়ে যায় কবিতা- নাচ- গান ও সুরের মূর্ছনায়। নব আনন্দে মেতে ছিল প্রবাসীগণ নূতন আলোর স্বপ্ন নিয়ে দিন বদলের প্রত্যাশায়। দু'দিনের অনুষ্ঠান ছিল সত্যিই ভিন্নতর ও স্বতন্ত্রেভরা। রবি ঠাকুরের ভাষায়- "সহস্র দিনের মাঝে আজিকার এই দিনখানি হয়েছে স্বতন্ত্র চিরন্তন।"

বিশেষ ঘোষনা

আপনি বিশ্বের যে কোন প্রান্তেই বাস করুন না কেন আপনার লেখা গল্প, কবিতা, ছড়া, সমীক্ষা আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানতে পাঠিয়ে দিন। আপনার নবজাত শিশুর ছবি, কমিনিওনের ছবি - নাম, তারিখ। শিক্ষাক্ষেত্রে সন্তানের বিশেষ কৃতিত্ব। নব-দম্পতির ছবিসহ নাম, স্থান। ২৫তম/৫০তম বিবাহ বার্ষিকীর ছবি, নাম/তারিখ/স্থান আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে, আমরা তা তেপান্তরীতে ছেপে দেব।

ঠিকানাঃ **PBCA** PO Box-1568 New York, NY 10159-1568
E-mail: sgomes06@yahoo.com
sgomes99@gmail.com

Joanna Victoria Gomes (Adi)
DOB: Nov 07, 2008
Father: Juel Gomes (Adi)
Mother: Lata Gomes (Adi)

Ishaan Mathew Gomes
DOB: Aug 14, 2008
Father: Joseph Gomes
Mother: Roselyn Gomes
Carle Place, Long Island
New York

Angelina C. Rozario
(Goon Goon)
DOB: Feb 01, 2008
Father: Xavier Tushar Rozario
Mother: Katherine Subarna Rozario

It is with great pleasure that we announce that our son, Lucan Thomas Rodrigues, graduated from St. George's University School of Medicine in May, 2008. He graduated as a member of the distinguished Honor Society Iota Alpha Epislon and ranked Ninth in his graduating Class of over 500 medical students. He is currently doing is Residency in Internal Medicine at Winthrop University Hospital in Mineola, Long Island. We request your blessings and prayer that God will guide him in his career to be a caring, compassionate and brilliant Physician. We are proud of him and wish him continued success as a Doctor of Medicine.

Kingsley & Clare (Sheba) Rodrigues
(Parents of Lucan T. Rodrigues)

Congratulations to John Romeo Gomes,
Who, along with four other students from Hofstra University, has been chosen for an accelerated Masters of Science Degree Program Fall Semester 2009 with a Full Scholarship.
Having scored a 27 on his MCATs (Medical College Admissions Test) he will complete his Masters of Science in Forensic Psychology within only one year at the Hofstra University School of Liberal Arts and Sciences, and then go on to study Forensic Psychiatry at New York University School of Medicine.
The Katherine and William Hofstra Memorial Scholarship is endowed to only five students during the course of the academic year on an annual basis and John Romeo Gomes is the youngest recipient this year in his academic class year.
It is his aspiration to become a Forensic Psychiatrist and work with the Federal Bureau of Investigations.
Best wishes to him and he thanks you all for your prayers.

Jibone & Jolly Gomes
(Parents of John R. Gomes)
97 Romaine Ave. Jersey City, NJ 07306

Shubro (Dominic) Cricket Dream

- Chitra (Ma)

Since he was a kid he dreamed about becoming a cricket player. He was so crazy about cricket that he didn't care about anything else, even me. While he was studying at Holy Cross High School, he used to go to Hashnabad Missionary field with his friends. When he came to America, he thought his dream was over. But by a turn of events, he resumed playing cricket in high school. Since then he was very happy. Because of his past experiences, he became a captain in the team. Later, his team won the PSAL (Public School Athletic League) championship. His name spread all over newspapers and websites like The Daily News, and Cricket International. Also he did a lot of interviews for his achievements. Because of his courage, responsibility and a good leadership skill, he was selected to play US National U-19 Championship in Florida. He went to Florida for a week and came back with a big smile on his face because his team won the U-19 Cricket Champion. I didn't think he would go that far playing cricket in America. His achievements proved that he could continue playing and become someone important in the Cricket history.

Christopher
and
Barnadette Joya Quiah
July 05, 2008
Queens, NY

Edward
and
Rosie D'Costa
August 30, 2008

Lucas
and
Christina
Manhattan, NY

Christopher
and
Lila Rozario
Sunrise, Florida

Philip Gabriel
and
Elizabeth Lila Gomes
Corona, New York

স্বর্গীয় তেরেজা রোজারিও

জন্ম ঃ
২৪শে এপ্রিল, ১৯২৭
বিবাহ ঃ
১৯৪৪
মৃত্যু ঃ
১৫ই অক্টোবর, ২০০৮

ভাওয়াল অঞ্চলের নাগরী ধর্মপল্লীর অন্তর্গত পানজোড়া গ্রাম নিবাসিনী তেরেজা রোজারিও স্বামী মৃত আর্থার রোজারিও বিগত ১৫ই অক্টোবর, ২০০৮ তার নিজ বাড়ীতে এক দর্ঘটনায় মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। ব্যক্তিজীবনে তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তিনি চার পুত্র সন্তান ও দু'কন্যা সন্তানের গর্বিতা মাতা ছিলেন। নিজ হাতে ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন। তিনি ছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর। আমরা তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

জন্ম ঃ
১৮ই মে, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ
মৃত্যু ঃ
২৫শে নভেম্বর, ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ
গ্রাম ঃ
হাসনাবাদ গ্রামপার বাড়ি

প্রিসিল্লা গমেজ

হাসনাবাদ গ্রামপার বাড়ি নিবাসিনী প্রিসিল্লা গমেজ বিগত ২৫শে নভেম্বর, ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ব্যক্তিজীবনে তিনি অত্যন্ত আদর্শবতী ও ধার্মিক ছিলেন। তিনি চার পুত্র সন্তান ও দু'কন্যা সন্তানের গর্বিতা মাতা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি অসংখ্য আপনজন ও শুভাকাঙ্গী রেখে গেছেন। আমরা তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।